গ্রন্থকার পরিচিতি

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বর্তমান শতকের এক অনন্যসাধারণ ইসলামী প্রতিভা। এ শতকে যে ক'জন খ্যাতনামা মনীষী ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা কায়েমের জিহাদে নেতৃত্ব দানের পাশাপাশি লেখনীর সাহায্যে ইসলামকে একটি কালজয়ী জীবন-দর্শন রূপে তুলে ধরতে পেরেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম।

এই ক্ষণজন্মা পুরুষ ১৩২৫ সনের ৬ মাঘ (১৯১৮ সালের ১৯ জানুয়ারী) সোমবার, বর্তমান পিরোজপুর জিলার কাউখালী থানার অন্তর্গত শিয়ালকাঠি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি শর্ষীনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আলিম এবং ১৯৪০ ও ১৯৪২ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে যথাক্রমে ফাযিল ও কামিল ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণায় নিরত থাকেন। ১৯৪৬ সালে তিনি এ ভূখণ্ডে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেন এবং সুদীর্ঘ চার দশক ধরে নিরলসভাবে এর নেতৃত্ব দেন।

বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) শুধু পথিকৃতই ছিলেন না, ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে এ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ৬০টিরও বেশি অতুলনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর 'কালেমা তাইয়েবা', 'ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা', 'মহাসত্যের সন্ধানে', 'বিজ্ঞান ও জীবন বিধান', 'বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব', 'আজকের চিন্তাধারা', 'পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি', 'সুন্নাত ও বিদয়াত', 'ইসলামের অর্থনীতি', 'ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন', 'সূদমুক্ত অর্থনীতি', 'ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা', 'কমিউনিজম ও ইসলাম', 'নারী', 'পরিবার ও পারিবারিক জীবন', 'আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ', 'আল-কুরআনের আলোকে শির্ক ও তওহীদ', 'আল-কুরআনের আলোকে নবুয়্যাত ও রিসালাত', 'আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার', 'ইসলাম ও মানবাধিকার', 'ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা', 'রাসূলুল্লাহ্‌র বিপ্লবী দাওয়াত', 'ইসলামী শরীয়াতের উৎস', 'অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম', 'অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ইসলাম', 'শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'ইসলামে জিহাদ', 'হাদীস শরীফ (তিন খণ্ড)' ইত্যাকার গ্রন্থ দেশের সুধীমহলে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে। এছাড়া অপ্রকাশিত রয়েছে তাঁর অনেক মূল্যবান পাণ্ডুলিপি।

মৌলিক ও গবেষণামূলক রচনার পাশাপাশি বিশ্বের খ্যাতনামা ইসলামী মনীষীদের রচনাবলি বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারেও তাঁর কোনো জুড়ি নেই। এসব অনুবাদের মধ্যে রয়েছে মওলানা মওদূদী (রহ)-এর বিখ্যাত তফসীর 'তাফহীমুল কুরআন', আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী-কৃত 'ইসলামের যাকাত বিধান (দুই খণ্ড)' ও 'ইসলামে হালাল হারামের বিধান', মুহাম্মদ কুতুবের 'বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত' এবং ইমাম আবু বকর আল-জাস্‌সাসের ঐতিহাসিক তফসীর 'আহকামুল কুরআন'। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যাও ৬০টিরও উর্ধ্বে।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-র অন্তর্গত ফিকাহ্‌ একাডেমীর একমাত্র সদস্য ছিলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সূচিত 'আল-কুরআনে অর্থনীতি' এবং 'ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস' শীর্ষক দুটি গবেষণা প্রকল্পেরও সদস্য ছিলেন। প্রথমোক্ত প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত দুটি গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ তাঁরই রচিত। শেষোক্ত প্রকল্পের অধীনে তাঁর রচিত 'সৃষ্টিতত্ত্ব ও ইতিহাস দর্শন' নামক গ্রন্থটি এখনও প্রকাশের অপেক্ষায়।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রহ) ১৯৭৭ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা সম্মেলন ও রাবেতা আলমে ইসলামীর সম্মেলন, ১৯৭৮ সালে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইসলামী দাওয়াত সম্মেলন, একই বছর করাচীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী মহাসম্মেলন, ১৯৮০ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত আন্তঃপার্লামেন্টারী সম্মেলন এবং ১৯৮২ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত ইসলামী বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

এই যুগস্রষ্টা মনীষী ১৩৯৪ সনের ১৪ আশ্বিন (১৯৮৭ সালের ১ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার এই নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। (ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)

খায়রুন প্রকাশনী

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

কালেমা তাইয়্যেবা

কালেমা তাইয়্যেবা

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

খায়রুন প্রকাশনী

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা),

দোকান নং - ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০

ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২, ৮৩৫৪১৯৬, ০১৭৩-০৩৪২৩০, ০১৭১-৯০৭৭৮৫

ভূমিকা

কুরআন, হাদীস, ইসলাম ও মুসলিম জাতির ইতিহাস এবং বর্তমান যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর রচিত অসংখ্য ইসলামী গ্রন্থ বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া ইসলামের মূলমন্ত্র 'কালেমায়ে তাইয়্যেবা'র অর্থ এবং যে তাৎপর্য আমি বুঝিতে পারিয়াছি, সংক্ষেপে তাহাই এই পুস্তিকায় সন্নিবেশিত করিয়া পাঠকদের সমীপে পেশ করিলাম। কালেমার অর্থ এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখিতে গিয়া এই পুস্তিকায় যাহা বিবৃত হইয়াছে, বলা বাহুল্য, আমার ঈমান—আমার মন ও মগজের স্থির বিশ্বাসেই তাহা লিখিয়াছি। আমি একান্তভাবে মনে করি যে, কালেমা তাইয়্যেবার অন্তত এইটুকু ব্যাপক ও বিস্তারিত অর্থ জানিয়া অন্তরের সহিত বিশ্বাস স্থাপন না করিলে ইসলামের এই মূলমন্ত্রকে জানা হয় না এবং তাহা পূর্ণরূপে বিশ্বাসও করা যায় না। উপরন্তু এই কালেমা অনুযায়ী আমাদের বাস্তব কর্মজীবনকে গঠন করাও সম্ভব হইতে পারে না। এই জন্যই সর্বসাধারণ মুসলমানদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিষয়টি যথাসম্ভব সহজ ভাষায় এবং সহজ কথায় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

বর্তমান কালের মুসলমানরা এই কালেমাকে অন্তত এতটুকু খোলাখুলি ও ব্যাপকভাবে জানিয়া-বুঝিয়া বিশ্বাস করুক এবং প্রথম যুগের মুসলমানদের ন্যায় ইহা হইতে তেমনি বিরাট বিপ্লবী শক্তি লাভ করিয়া পৃথিবীতে আবার দুর্জয় হইয়া উঠুক, ইহাই আমার অন্তরের ঐকান্তিক কামনা। ১৯৫০ সনে এই পুস্তিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। বিগত বৎসরগুলিতে ইহার বহু সংস্করণ সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। সমাজে এই পুস্তিকা সমাদৃত হইয়াছে দেখিয়া আমি আল্লাহ্ তা'আলার লাখ লাখ শোকর আদায় করিতেছি।

একটি প্রয়োজনীয় কথা এখানে বলিয়া রাখি। ভুল ও ভ্রান্তিতে গড়া মানুষ। কালেমার বিস্তারিত অর্থ লিখিতে গিয়া আমি কোথাও ভুল করিয়া থাকিতে পারি; তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। চিন্তাশীল পাঠকগণ যদি আমার ভুল আমাকেই ধরাইয়া দেন, তবেই আমার প্রতি সুবিচার করা হইবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, নিছক কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতেই কালেমার এই ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে; তাই ইহার ভুলও একমাত্র কুরআন ও হাদীস হইতেই প্রমাণ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত সত্য-মিথ্যা বা ভুল-নির্ভুল নির্ধারণের জন্য অন্য কোন মানদণ্ড আমি স্বীকার করি না।

মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

১-জুন ১৯৮৭

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْ
عُهَا فِيْ السَّمَاءِ- تُؤْتِيْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا - (ابراهيم -٢٤-٢٠)

তুমি কি লক্ষ্য কর নাই আল্লাহ্ কিভাবে উপমা দিয়া দিয়া বুঝাইয়াছেন? কালেমা তাইয়্যেবা একটি পবিত্র বলিষ্ঠ উত্তম বৃক্ষ যেন। উহার মূল (মাটির) গভীরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত এবং উহার শাখা-প্রশাখা মহাশূন্যে (বিস্তীর্ণ)। উহা সব সময় উহার আল্লাহ্— মালিকের অনুমতিক্রমে স্বীয় ফল প্রদান করিতে থাকে। (সূরা ইবরাহীম ঃ ২৪ ও ২৫)

بسم الله الرحمن الرحيم

কালেমা তাইয়্যেবা

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

শুরু কথা

কালেমা তাইয়্যেবা ইসলামের মূল ঘোষণা। ইহা না পড়িয়া কোন মানুষই ইসলামের সীমার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। এই জন্যই কোন কাফির অথবা মুশরিক ব্যক্তি যখন ইসলাম কবুল করিতে চায়, তখন সর্বপ্রথমই তাহাকে এই কালেমা পড়িতে হয়। মুসলমানদের ঘরে কোন সন্তানের জন্ম হইলেও এই কারণে তাহার কানে সর্বপ্রথম এই কালেমার আওয়াজ শোনানো হয়। মুসলমানদের মহল্লায় মহল্লায় দিন-রাতের মধ্যে পাঁচ বার মুয়াজ্জিন এই কালেমা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া সকলকে নামাযের দিকে আহ্বান জানায়। নামাযের মধ্যে এই কালেমা বারবার পড়িতে হয়। কুরআন শরীফের পাতায় পাতায় এই কালেমার কথা নানাভাবে লিখিত আছে। ইসলামে এই কালেমার গুরুত্ব যে কতখানি, ইহার দ্বারাই তাহা বুঝিতে পারা যায়। অতএব প্রত্যেকটি মুসলমানের পক্ষেই এই কালেমার অর্থ খুব ভাল করিয়া জানিয়া লওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

বীজ বপন না করিলে যেমন গাছ হইতে পারে না, তেমনি এই কালেমা মানুষের হৃদয়-মনে ভাল করিয়া শিকড় গাড়িতে না পারিলে মানুষের জীবন-ক্ষেত্রে ইসলামের গাছ কিছুতেই জন্মিতে পারে না। বীজ বপন করিলেই গাছ হয় এবং সেই গাছের যেমন কাণ্ড, ডাল-পালা এবং ফুল ও ফল হইয়া থাকে, তেমনি মুসলমানগণ এই কালেমার অর্থ খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া-শুনিয়া তাহা মনে-প্রাণে গ্রহণ না করিলে ইসলামের এই নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত আদায় করা, হারাম হালাল বাছিয়া চলা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যাপারে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লক্ষ্য করিয়া কাজ করা— প্রভৃতি গুণাবলী মুসলমানদের জীবনে কিছুতেই ফুটিয়া উঠিতে পারে না।

বীজ যদি খারাপ হয়, তবে তাহা হইতে গাছ অঙ্কুরিত হইতে পারে না। অনুরূপভাবে মানুষ যদি এই কালেমাকে বুঝিয়া শুনিয়া কবুল না করে, কিংবা ইহার কোন ভুল অর্থ গ্রহণ করে, তবে তাহার জীবনে ইসলামের হুকুম-আহকাম পালন করিয়া চলা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না।

আপনি যদি অন্য কারোর সহিত কোন কারবার করেন— তাহা যে কারবারই হউক না কেন—তবে প্রথমেই আপনাকে তাহার সহিত একটা কথা পাকাপাকিভাবে ঠিক করিয়া লইতে হয়; নতুবা আপনার কাজ ভাল করিয়া

চলিতে পারে না। আপনি যদি কাহাকেও কোন টাকা-পয়সা ধার দেন, তবে প্রথমে আপনি তাহার দ্বারা এই কথা স্বীকার করাইয়া লন যে, টাকা নিয়া সে ঠিক সময়মত পরিশোধ করিবে এবং অমুক তারিখের মধ্যে পরিশোধ করিয়া দিবে। সর্বোপরি, টাকা নিয়া তাহা সে কখনও অস্বীকার করিবে না ইত্যাদি। এই সব কথা সে যদি স্বীকার করে তবেই আপনি তাহাকে টাকা ধার দিয়া থাকেন; নতুবা আপনি কিছুতেই কাহাকেও এক পয়সা ধার দেন না।

আপনি যদি আপনার জমি কাহাকেও চাষ করিতে দেন, তবে তাহার সহিতও আপনার দরকারী বন্দোবস্ত আগেই করিয়া লইতে হয়। আপনি নিজে যদি কাহারও জমি চাষাবাদ বা ভোগ-ব্যবহার করিতে চান, তবে আপনাকে জমির মালিকের শর্ত স্বীকার করিয়া 'কবুলিয়ত-নামা' লিখিয়া দিতে হয়। ঠিক এইরূপই, মুসলমানকে সমস্ত জীবনব্যাপী যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে কারবার করিতে হয়, এই কালেমা পড়িয়া সেই আল্লাহ্‌র সঙ্গেই জীবনের সমস্ত কাজের বিষয়ে কথাবার্তা পাকা করিয়া লওয়া হয়। দলিলে কি লেখা হইয়াছে, তাহা না জানিয়াই যদি আপনি তাহাতে দস্তখত করিয়া দেন, তবে সে দলিলের শর্ত অনুসারে আপনি কিছুতেই কাজ করিতে পারিবেন না। কারণ, দলিলের কোন্ কোন্ শর্ত স্বীকার করিয়া আপনি দস্তখত করিয়াছেন, তাহা আপনি জানেন না। ফলে আপনার কাজকর্ম সেই দলিলের শর্তের বিরুদ্ধে যাইতে পারে। এইরূপেই, আপনি কালেমা তাইয়্যেবা পড়িয়া ইসলামের সীমার মধ্যে আসিলেন, নিজেকে মুসলমান ও 'আল্লাহ্‌র দাস' বলিয়া মনে করিলেন; কিন্তু আপনি জানিলেন না যে, কালেমা পড়িয়া আপনি কোন্ কোন্ কাজ করিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন আর কোন্ কোন্ কাজ করিবেন না বলিয়া ওয়াদা করিয়াছেন। এইরূপ অবস্থা হইলে আপনার কালেমা পাঠ করার কোনই মূল্য থাকে না। আপনার এই কালেমা পড়া আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হইতে পারে না। আপনি প্রকৃত 'মুসলমান' ও 'আল্লাহ্‌র বান্দাহ্' হইতে পারেন না। আপনার জীবনের কোন কাজই সেই কালেমা অনুসারে সমাধা হইতে পারে না।

বস্তুত এই কালেমাটি সর্বদিক দিয়া অত্যন্ত বিরাট ও মহান। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই এই কালেমার সাক্ষ্য ঘোষণা করিয়াছেন; ইহার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন সমস্ত ফেরেশতা এবং সৃষ্টিকুলের মধ্যেকার সমস্ত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ। ইহা অতীব সত্য ও সঠিক ঘোষণা, ইনসাফ ও ন্যায়পরতার অকাট্য প্রতীক। এই কালেমা দ্বারা যাহা ঘোষণা করা হয়, তাহাই সত্য ও যথার্থ, প্রকৃত অবস্থার সহিত পুরাপুরি সামঞ্জস্যশীল। ইহাই ইসলামের মূল ঘোষণা। এই কালেমার প্রকৃত মর্মবাণী না জানিলে, পরম সত্য বলিয়া অন্তর দিয়া তাহা মানিয়া না লইলে, মুখে স্পষ্টভাবে ইহার সত্যতা ঘোষণা না করিলে এবং ইহাকে পুরাপুরিভাবে মানিয়া চলিতে অন্তর দিয়া রাজী না হইলে কেহই মুসলিম হইতে পারে না।

এই কালেমা 'তওহীদী আকীদা'র বলিষ্ঠ ঘোষণা এবং 'শির্‌কী আকীদা' সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার ও অমান্য করার ঘোষণা। এই ঘোষণা দ্বারাই একজন মুসলমান শির্‌কী আকীদার জঞ্জাল ও দুঃখময় পরিণাম হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

ইহা হইতে পুরাপুরি ফায়দা পাইতে হইলে সাতটি শর্ত পূরণ করিতে হইবে। প্রথমত, জ্ঞান— ইহা দ্বারা কি অস্বীকার করা হইল এবং কি স্বীকার করা হইল তাহা জানা। দ্বিতীয়ত, যাহা জানা গেল তাহা মনে-প্রাণে দৃঢ়রূপে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা; তাহাতে একবিন্দু সন্দেহ পোষণ না করা। তৃতীয়ত, উহার প্রতি পরম নিষ্ঠা বোধ করা— শির্‌কের বিরুদ্ধে কঠোর ও অনমনীয় মনোভাব রাখা। চতুর্থত, এমন সত্যতা সহকারে উহার ঘোষণা দেওয়া যেন উহাতে মুনাফিকীর লেশমাত্র না থাকে। পঞ্চমত, এই কালেমা'র প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা ও মনের দরদ পোষণ করা— সেজন্য অন্তরে আনন্দ অনুভব করা। ষষ্ঠত, উহার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য পোষণ করা। উহার দাবি পূরণে প্রস্তুত হওয়া, যে সব কাজ দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রতি নিষ্ঠা প্রমাণিত হয় এবং তাঁহার সন্তুষ্টি পাওয়া যায় তাহা করিতে রাজী হওয়া এবং সপ্তমত, উহার বিপরীত সব কিছুকেই অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করিতে মনে-প্রাণে প্রস্তুত হওয়া।

এখন আপনারা পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছেন যে, কালেমা তাইয়্যেবা না পড়িয়া যেমন কেহ ইসলামের সীমার মধ্যে আসিতে পারে না, ঠিক তেমনি ইহার অর্থ না জানিয়া, ইহা শুধু মুখে মুখে উচ্চারণ করিয়াই কেহ খাঁটি মুসলমান হইতে এবং মুসলমানের মত কাজ করিতে পারে না। বর্তমান দুনিয়ার অধিকাংশ মুসলমান যে ইসলামের হুকুম-আহকাম পালন করে না— 'মুসলমান' হইয়াও যে তাহারা অমুসলমানের মত কাজ-কর্ম ও আচরণ করে উহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহারা কালেমা পড়ে এবং বিশ্বাসও করে বটে, কিন্তু জানে না যে, তাহারা কি পড়ে আর কি বিশ্বাস করে। ইহার ফলে দেখিতেছি, কোটি কোটি মুসলমান দুনিয়ায় বাস করে অথচ ইসলাম পালন করিয়া প্রকৃত মুসলমানের মত অধিকাংশই জীবন যাপন করে না; বরং দেখা যাইতেছে যে, তাহারা প্রত্যেক পদে পদে ইসলামের খেলাফ কাজ করে। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

কালেমা পড়িয়া উহার অর্থ বুঝি না বলিয়া যেমন আমরা খাঁটি মুসলমানের ন্যায় কাজ করিতে পারি না, ঠিক তেমনি এই কারণেই আমরা আল্লাহ্‌র রহমতও লাভ করিতে পারিতেছি না। ফলে আমরা নানা প্রকার দুঃখ ও মুসীবতে পড়িয়া গিয়াছি— অধঃপতনের শেষ সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছি।

কাজেই এখন যদি আমরা আবার প্রকৃত মুসলমান হইতে চাই, দুনিয়ার বুকে যদি আমরা আবার আল্লাহ্‌র রহমত পাইয়া উন্নতি করিতে ইচ্ছুক হই এবং পরকালেও যদি আমরা সত্যিকার মুসলমান হিসাবে আল্লাহ্‌র সম্মুখে হাযির হইতে

ইচ্ছা করি, তাহা হইলে এই কালেমা তাইয়্যেবার অর্থ আমাদের ভাল করিয়া জানিয়া ও বুঝিয়া লইতে হইবে এবং ধীরে ধীরে তদানুযায়ী নিজেদের জীবনকে ঢালিয়া গঠন করিতে হইবে। তাই আমরা এখানে কালেমা তাইয়্যেবার বিস্তারিত অর্থ লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি।

কালেমা তাইয়্যেবার অর্থ

কালেমা তাইয়্যেবা কোন লম্বা চওড়া জিনিস নয়, ইহা আপনারা সকলেই জানেন :

لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ–

'আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই— হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্র রাসূল।

এই কালেমার দুইটি অংশঃ لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ প্রথম অংশ

এবং مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ দ্বিতীয় অংশ

প্রথম অংশের অর্থ ঃ 'নাই (কোন) মা'বুদ— আল্লাহ্ ছাড়া।' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কেহ মা'বুদ বা প্রভু নাই, যাহার গোলামী বা দাসত্ব করা যাইতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলাই একমাত্র মা'বুদ, প্রভু ও মালিক এবং ভয় করা ও মানিয়া চলার যোগ্য। তিনি সারে জাহানের সৃষ্টিকর্তা— আমরা তাঁহার সৃষ্টি। তিনি সকলের প্রভু— আমরা তাঁহার অধীন দাস। তিনি সারে জাহানের মনিব এবং আমাদেরও মালিক। ভয় একমাত্র তাঁহাকেই করিতে হইবে। তিনিই একমাত্র উপাস্য। আমরা কেবল তাঁহারই দাসত্ব স্বীকার করি, কেবল তাঁহারই আনুগত্য করি এবং কেবল তাঁহারই আইন মানিয়া চলি।

আর দ্বিতীয় অংশের অর্থ ঃ মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্র রাসূল অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে তাঁহার আদর্শের প্রচারক ও প্রতিষ্ঠাতারূপে মানব জাতির নেতা ও পথ-প্রদর্শকরূপে পাঠাইয়াছেন।

আগেই বলিয়াছি, এই কালেমাই হইতেছে ইসলামের মূল বুনিয়াদ। ইহার উপর ইসলামের অন্যান্য বহু হুকুম-আহকামের বিরাট 'ইমারত' দাঁড়াইয়া থাকে। ইহা না হইলে সে 'ইমারত'এক মুহূর্তের তরেও তৈয়ার হইতে পারে না— দাঁড়াইতেও পারে না। এই কালেমার মধ্যে আল্লাহ্র যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, ইসলামে তাহাই আল্লাহ্র সঠিক পরিচয়। এইসব গুণ-বৈশিষ্ট্য যে সত্তার মধ্যে বর্তমান, ইসলামে তাঁহাকেই 'আল্লাহ্' বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। আবার ঐ সমস্ত গুণ একত্রে যাহার মধ্যে বর্তমান নাই, সে কখনও 'আল্লাহ্' হইতে পারে না; ইসলাম তাহাকে আল্লাহ্ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়।

আর মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহ্র রাসূল বলিয়া এ কথাই ঘোষণা করা হইয়াছে যে, তিনি শুধু মুহাম্মাদ (স) নামে একজন মানুষই নহেন, বরং তিনি আল্লাহ্র

রাসূলও বটে এবং ইহাই হইতেছে তাঁহার আসল পরিচয়। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্কে সঠিকভাবে মানিতে হইলে মুহাম্মাদ (স) নামক রাসূলকেও সঠিকরূপে ও পুরাপুরিভাবে মানিতে হইবে।

প্রথম অংশের ব্যাখ্যা

এই কালেমার প্রথম অংশকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগ হইতেছে নেতিবাচক, অর্থাৎ কোন মা'বুদ নাই— প্রভু বা সৃষ্টিকর্তাও কেহ নাই। আমি কাহাকেও ভয় করি না, কাহারও নিকট নতি স্বীকার করি না, কাহারও আইন মানি না, কাহারও দয়া-অনুগ্রহ বা সাহায্য আমি চাহি না, কাহাকেও উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী স্বীকার করি না। কাহারও ইবাদত-বন্দেগী করি না। এইসব দিক দিয়া যেকেহ আমার উপর কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তার করিতে চাহিলে, আমি তাহাকেই অস্বীকার করি। সকলের প্রতিই আমি বিদ্রোহী। কাহারও সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। আর দ্বিতীয় অংশ হইতেছে ইতিবাচক; অর্থাৎ এই সব দিক দিয়া একমাত্র আল্লাহ্কেই আমি স্বীকার করি ও মানি।

একজন মানুষ যখনই এই কালেমা পাঠ করে, তখন সে ইহার মধ্য দিয়া এই কথাই স্বীকার করে যে, এই দুনিয়া এবং ইহার সমস্ত জীব-জন্তু ও বস্তু-সামগ্রী— এইসবের কোনটিই সৃষ্টিকর্তা ছাড়া অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে নাই; ইহার সবই সৃষ্টিকর্তারই সৃষ্টি এবং সে সৃষ্টিকর্তাও বহু নয়, মাত্র একজন। আর সেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেহ নয়। ইহা কুরআন মজীদেরই সুস্পষ্ট ঘোষণা। বলা হইয়াছে ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ –

তিনিই আল্লাহ্ যিনি আকাশ-রাজ্য ও পৃথিবী এবং এই দুইটির মধ্যে যাহা কিছু আছে, তাহা সবই কালের ছয়টি ভাগে সৃষ্টি করিয়াছেন।

(সূরা সাজদাহ্ ঃ ৪)

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ–لَااِلٰهَ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ –

তোমাদের মা'বুদ— তিনি একমাত্র মা'বুদ; তিনি ছাড়া আর কেহ মা'বুদ নাই— তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। সূরা বাকারা ঃ ৩৬)

আল্লাহ্ তা'আলা সারে জাহানকে শুধু সৃষ্টি করিয়াই ছাড়িয়া দেন নাই, বরং ইহাকে রীতিমত পরিচালনা করা, প্রাণশক্তি ও দরকারী খাদ্য দিয়া ইহাকে এবং ইহার সমস্ত জীব-জন্তুকে বাঁচাইয়া রাখা ও লালন-পালন করা প্রভৃতি কাজও করেন। এই সব ব্যাপারেও তাঁহার কেহ শরীক নাই— কেহ সাহায্যকারীও নাই।

আল্লাহ্ তা'আলা সারে জাহানের অধিবাসীদের পালনকর্তা, মালিক ও প্রভু (ربا العلمين)। আসমান ও জমিন এবং এর মধ্যকার সব জিনিসের সব বিত্ত-সম্পত্তি ও ধন-দৌলতের একমাত্র মালিক তিনিই।

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا-

দুনিয়ার সমস্ত জীবকে খাদ্য দান করার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলার।

(সূরা হূদ ঃ ৬)

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ -لَا اِلٰهَ اِلَّاهُوَ- خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَاعْبُدُوْهُ - وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ-

তিনিই তোমাদের আল্লাহ্, (যাঁহার মধ্যে উল্লিখিতরূপ গুণাবলী বর্তমান) তিনি ছাড়া আর কেহ মা'বুদ নাই। তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের সৃষ্টিকর্তা; অতএব কেবল তাঁহারই দাসত্ব কর— বন্দেগী কর। তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের ব্যাপারেই দায়িত্বশীল। (সূরা আন'আম ঃ ১০২)

উল্লিখিত আয়াতগুলি হইতে একথা পরিষ্কাররূপে প্রমাণ হইয়া গেল যে, সারে জাহানের সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং তিনি আল্লাহ্ তা'আলা ভিন্ন আর কেহ নহে। তিনি এক ও একক; সারে জাহানের পালন কর্তা, রক্ষাকর্তা, রিযিকদাতা ও প্রভু একমাত্র তিনিই। অতএব সেই এক আল্লাহ্রই দাসত্ব কবুল করা, কেবল তাঁহাকেই মা'বুদ ও প্রভু বলিয়া স্বীকার করা এবং অন্য কাহারও মধ্যে এইসব গুণ আছে বলিয়া মনে না করা সমস্ত মানুষের কর্তব্য। কালেমা তাইয়্যেবার ইহাই গোড়ার কথা। কালেমা তাইয়্যেবার বিস্তারিত অর্থ খোলাখুলিভাবে পাওয়া যায় কুরআন শরীফের নিম্নলিখিত আয়াতটিতেঃ

ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ- مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلَّا اَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ - اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ - اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ - ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ-

হে মানুষ! ভিন্ন ভিন্ন ও একাধিক মা'বুদ স্বীকার করা ভাল, না একজন প্রকৃত শক্তিমান এবং সকলের উপর জয়ী মা'বুদ ভাল? জানিয়া রাখ, এক আল্লাহ্কে ছাড়িয়া তোমরা আর যে মা'বুদ নামের জিনিসগুলির ইবাদত ও বন্দেগী কর, তাহা কতকগুলি অর্থহীন নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। আর সেই নামগুলিও তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা মিলিয়া রাখিয়াছ— আল্লাহ্ সে সম্পর্কে কোন যুক্তি প্রমাণই নাযিল করেন নাই। অথচ হুকুম দেওয়া ও আইন রচনা করার অধিকার ও ক্ষমতা এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারও নাই। তিনি সকলের প্রতি এই আদেশ করিয়াছেন যে, কেবল আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারও দাসত্ব ও বন্দেগী করিও না। ইহাই একমাত্র সত্য ও মজবুত 'দ্বীন'— জীবন যাপনের নিখুঁত সুদৃঢ় ব্যবস্থা। কিন্তু অনেক মানুষই তাহা জানে না।

কুরআনের এই আয়াত দুইটিতে কালেমা তাইয়্যেবার অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে। এই আয়াত দুইটির সারাংশকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

প্রথমত ঃ আল্লাহ্র একত্ব। এক আল্লাহ্কে স্বীকার করায় মানুষের ইহকাল ও পরকাল উভয় জীবনেরই সুখ-শান্তি লাভ হওয়া সম্ভব। একাধিক খোদা স্বীকার করায় মানুষের জীবন নানাবিধ দুঃখ ও অশান্তিতে ধ্বংস হইয়া যাওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়ত ঃ মুশরিকগণ আল্লাহ্কে ছাড়িয়া যে সব দেব-দেবী ও মানুষ-প্রভুর পূজা, উপাসনা ও দাসত্ব করে, তাহা সর্বতোভাবে অমূলক ও ভিত্তিহীন; তাহা কতকগুলি নামের সমষ্টি মাত্র। আসলে উহাদের কোনই অস্তিত্ব নাই আর সেসব নামও আল্লাহ্ তা'আলা রাখেন নাই— মুশরিকগণ নিজেরাই তাহা রাখিয়াছে। মানুষের ক্ষতি বা উপকার করিবার একবিন্দু ক্ষমতা উহাদের নাই। আর সেই ক্ষমতা না থাকিলে কাহাকেও ইবাদত বা বন্দেগীর যোগ্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না।

তৃতীয়ত ঃ মানুষের কর্মজীবনের জন্য আইন-বিধান রচনা করা— কোন কিছুর আদেশ করা ও নিষেধ করার ক্ষমতা এবং অধিকার এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারও নাই। যাহারা এক আল্লাহ্কে স্বীকার করিবে, তাহারা সেই এক আল্লাহ্র দেওয়া আইন ও বিধান ছাড়া আর কিছুই মানিতে পারিবে না। তাহারা নিজেদের ব্যক্তি জীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে এবং তাহাদের ধন-সম্পদে ভোগ-ব্যবহার ও ব্যয়-বন্টনে কেবলমাত্র আল্লাহ্র দেওয়া বিধি-বিধানই মানিয়া চলিতে বাধ্য হইবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলাই সার্বভৌমত্ব তথা সর্বোচ্চ ক্ষমতার নিরংকুশ মালিক। ইহা অন্য কাহাকেও দেওয়া যাইতে পারে না।

চতুর্থত ঃ আল্লাহ্ তা'আলাই সকলেরই মা'বুদ; মানুষ কেবল তাঁহারই সদা— তাঁহারই বান্দা। মানুষ এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও অধীনতা ও আনুগত্য স্বীকার করিতে পারে না— অন্য কাহারও পূজা-উপাসনাও (ইবাদত-বন্দেগী) করিতে পারে না।

পঞ্চমত ঃ এবং শেষ কথা এই যে, উল্লিখিত চারটি বুনিয়াদী আকীদার সমন্বয়ে মানুষের জন্য আল্লাহ্র তরফ হইতে যে জীবন বিধান রচনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাই একমাত্র অক্ষয় ও মজবুত ব্যবস্থা। ইহা ছাড়া অন্য কোন মতের ধর্ম বা নীতি কিংবা আদর্শ অথবা জীবন বিধান মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য ও চিরস্থায়ী হইতে পারে না— তাহা শান্তি ও সুখেরও ধর্ম হইতে পারে না। ইহার কোন একটি কথাও যদি কেহ বদলাইতে চেষ্টা করে, তবে সে এই ধর্মের প্রকাশ্য দুশমন। বলা বাহুল্য, সেই মজবুত ধর্ম হইতেছে একমাত্র ইসলাম।

হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহার পিতা ও জনগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেনঃ

اِنَّنِىْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ–اِلَّا الَّذِىْ فَطَرَنِيْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ –

তোমরা যাহাদের দাসত্ব ও পূজা-উপাসনা কর, আমি তাহাদের সবকিছু হইতে নিঃসম্পর্ক হওয়ার ঘোষণা দিতেছি আর স্বীকার করিয়া লইতেছি কেবল সেই মহান সত্তাকে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। নিশ্চয়ই তিনি আমাকে পথ দেখাইবেন। (সূরা আয্ -যুখরুফ ঃ ২৬ ও ২৭)

ইহার পরই আল্লাহ্ বলিয়াছেনঃ

وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ –

তিনি উক্ত কালেমা (ঘোষণা)-টিকে তাহার পিছনে স্থায়ী করিয়া রাখিয়া গেলেন, যেন সেই লোকেরা এই দিকে ফিরিয়া আসিতে পারে।

(সূরা আয্-যুখরুফ ঃ ২৮)

হযরত ইবরাহীম (আ) প্রথম ঘোষণা দ্বারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব মা'বুদকেই অস্বীকার করিলেন এবং কেবল মহান সৃষ্টিকর্তার দাসত্ব স্বীকার করার কথাকেই বহাল রাখিলেন। এইরূপ ঘোষণা দ্বারা আসলে তিনি ভিন্নতর ভাষায় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এরই ঘোষণা দিলেন এবং এই কালেমাটিকেই সমস্ত মানুষের জন্য স্থায়ী ঘোষণা বানাইয়া দিলেন। বস্তুত এই কালেমা দ্বারা একদিকে যেমন দাসত্ব-আনুগত্য, ভয়-ভীতি পোষণ, রহমতের প্রত্যাশা এবং আইন পালনের দিক দিয়া কেবলমাত্র আল্লাহ্কেই স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তেমনি সেই সঙ্গেই এই সব দিক দিয়া আল্লাহ্ ছাড়া অপর কাহাকেও স্বীকার করার শির্ককে পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করা হয়। ইহাই হইল ইসলামের খালেস তওহীদী আকীদা। এই আকীদা সুস্পষ্ট ও অকুণ্ঠভাবে স্বীকার ও গ্রহণ করা ছাড়া কাহারও পক্ষে 'মুসলিম' হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'আলা এইরূপ আকীদা গ্রহণেরই নির্দেশ দিয়াছেন ঃ

قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ – اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ –

বল হে নবী ! আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে, আমি একান্তভাবে বান্দা হইব— দাসত্ব করিব কেবলমাত্র আল্লাহ্র; তাঁহার সহিত কোনক্রমেই শির্ক করিব না। আমি তাঁহারই দিকে আহ্বান জানাইতেছি এবং তাঁহারই নিকট আমার আশ্রয়— চূড়ান্ত পরিণতি। (সূরা রা'দ ঃ ৩৬)

প্রত্যেকটি মানুষকে যেমন একটি নিজস্ব আকীদা গ্রহণ করিতে হয়, তেমনি নিজের গৃহীত ও নিজের কাছে একমাত্র সত্য বলিয়া বিবেচিত আকীদাটি গ্রহণের জন্য সমাজের অন্যান্য লোককেও আহ্বান জানাইতে হয়। কিন্তু এই আহ্বান হইতে পারে পুরাপুরিভাবে আল্লাহ্র বন্দেগী কবুল করার আহবান। এই আহবান ছাড়া অন্য কোন আহবান— আল্লাহ্কে অস্বীকার বা তাঁহার সহিত শির্ক করার

কোন আহবান জানানোর কাহারও একবিন্দু অধিকার থাকিতে পারে না। নবী-রাসূলগণ এই দাওয়াত দেওয়ার জন্যই প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা জীবনভর এই দাওয়াত দিয়া গিয়াছেন দুনিয়ার মানুষকে।

কালেমায়ে তাইয়্যেবার ইতিহাস

কালেমা তাইয়্যেবা প্রথম অংশের অর্থ ও ব্যাখ্যা এইখানেই শেষ করা যাইতেছে। এখন দেখিতে হইবে যে, ইসলামের কালেমা প্রথম অংশে যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহা কি দুনিয়ায় নূতন কথা, না ইহার পিছনে কোন ইতিহাস আছে? কুরআনের পৃষ্ঠায়ই ইহার বিবরণ পাওয়া যাইবে।

কুরআন শরীফের পৃষ্ঠা উল্টাইলেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার একত্বের কথা পৃথিবীতে ইহাই নূতন নয়; বরং দুনিয়ার মানুষের নিকট যত নবীই আসিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ উম্মতকে এই শিক্ষা দিয়াছেন— আল্লাহ্ সম্পর্কে তাহাদের মধ্যে এই ধারণাই প্রচার করিয়াছেন। কুরআনে হযরত মুহাম্মাদ (স) কে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّانُوْحِىْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآاِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ –

হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বে যত নবীই আমি পাঠাইয়াছি, তাঁহাদের সকলেরই প্রতি ওহী যোগে আমি এই আদেশ করিয়াছি যে, আমি ছাড়া আর কেহই 'ইলাহ' বা মা'বুদ ও প্রভু নাই। অতএব তোমরা সকলে কেবল আমারই দাসত্ব ও বন্দেগী কবুল কর। (সূরা আম্বিয়া ঃ ২৫)

এই আয়াত হইতে নিঃসন্দেহে বোঝা গেল যে, দুনিয়ার প্রত্যেক নবীই তওহীদের দাওয়াত দিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ এখানে আমরা কয়েকটি ঐতিহাসিক আয়াত উদ্ধৃত করিতেছি।

১. হযরত নূহ (আ) তাঁহার সমকালীন জনগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ঃ

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ –

হে জনগণ, এক আল্লাহ্ তা'আলার দাসত্ব ও বন্দেগী কবুল কর; কারণ তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন প্রভু বা ইলাহ্ নাই। (সূরা আ'রাফ ঃ ৫৯)

২. হযরত ইউনুস (আ) তাঁহার সমকালীন জনগণকে বহু দিন পর্যন্ত তওহীদের দাওয়াত দিয়াছেন; কিন্তু জনগণ তাঁহার দাওয়াত গ্রহণ করে নাই। অবশেষে তিনি নিরাশ হইয়া দেশ হইতে চলিয়া যান। পথিমধ্যে তিনি নদীতে পড়িয়া মাছের পেটে যাইতে বাধ্য হন। এই মাছের পেটে বসিয়া হযরত ইউনুস (আ) এই দো'আ পড়িয়াছেনঃ

لَآاِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ -

হে আল্লাহ্! তুমি ছাড়া আর কেহ মা'বুদ নাই। আমি কেবল তোমারই পবিত্রতা ও গুণ-গরিমা বর্ণনা করি। নিশ্চয়ই আমি জালিম ও অন্যায়কারীদের মধ্যে একজন। (সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৮৭)

৩. হযরত মূসা (আ) নিজের সমকালীন জনগণকে আজীবন তওহীদের দাওয়াত দিয়া এক সময় বলিয়াছেন ঃ

اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ -

আল্লাহ্কে বাদ দিয়া তোমাদের জন্য আর একজন মা'বুদ তালাশ করিয়া আনিব কি? অথচ একমাত্র আল্লাহ্ই তোমাদিগকে দুনিয়ার সমস্ত লোকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান দান করিয়াছেন। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৪০)

৪. হযরত সালেহ (আ) নিজ সময়ের জনগণকে আহবান জানাইয়াছেন এই বলিয়াঃ

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ -

হে জনগণ! কেবল আল্লাহ্ তা'আলার দাসত্ব ও বন্দেগী কবুল কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কেহ মা'বুদ নাই।

৫. হযরত শু'আইব (আ) তাঁহার সমকালীন জনগণকে বলিয়াছেন ঃ

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ -

হে আমার জনগণ ! কেবল আল্লাহ্ তা'আলার দাসত্ব ও ইবাদত কর; তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন মা'বুদ নাই। (সূরা হূদ ঃ ৮৪)

হযরত হূদ (আ) যখন দাওয়াত দিলেন; হে জনগণ! তোমরা কেবলমাত্র এক আল্লাহ্র দাসত্ব ও ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের ইবাদত পাওয়ার যোগ্য আর কেহই নাই, তখন জনগণ বলিল ঃ

اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا

তুমি আমাদিগকে এই কথা বলিতে আসিয়াছ যে, আমরা একমাত্র আল্লাহ্রই দাসত্ব-বন্দেগী করিব এবং আমাদের পূর্বপুরুষ যাহাদের বন্দেগী করিত তাহাদিগকে ত্যাগ করিব? (সূরা আ'রাফ ঃ ৭০)

ইহারা মুশ্রিক ছিল এবং আল্লাহ্র বন্দেগী করার সঙ্গে সঙ্গে অন্যদেরও বন্দেগী করিত। একান্তভাবে এক আল্লাহ্র বন্দেগী করিতে তাহারা রাজী হইতেছিল না। এই বন্দেগীর অর্থ ইবাদত করা যেমন, তেমনি ভয় করা, আইন মানিয়া চলাও।

এখানে এই কয়টি আয়াত উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি।

কুরআন শরীফে যত নবীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের তওহীদের দাওয়াত ও কাজকর্ম সম্পর্কে মোটামুটি বিবরণও কুরআন শরীফে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা সবই উল্লেখ করিতে গেলে বইয়ের কলেবর বড় হইয়া যাইবে। ইহার পর আমরা কুরআন শরীফেই দেখিবঃ শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) কে আল্লাহ্ তা'আলা কি দাওয়াত প্রচার করিবার জন্য দুনিয়ায় পাঠাইয়াছিলেন।

হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে ঃ

قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِىْ بَرِىْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ -

হে মুহাম্মাদ! তুমি বলিয়া দাও যে, কেবল সেই আল্লাহ্ই প্রকৃত মা'বুদ— তিনি এক ও একক এবং আমি নিজে তোমাদের শির্ক মোটেই সমর্থন করি না; আমি উহা হইতে সম্পূর্ণ দায়িত্বমুক্ত। (সূরা আন'আম ঃ ১৯)

'তোমাদের শির্ক' অর্থ এক আল্লাহ্র সঙ্গে তোমরা আর যাহাকে যাহাকে মা'বুদ গণ্য কর এবং যাহাদের পূজা-উপাসনা কর, আমি কিন্তু তাহাদিগকে আদৌ স্বীকার করি না; বরং আমার ঘোষণা হইল ঃ

قُلْ هُوَ رَبِّىْ لَآاِلٰهَ اِلاَّهُوَ - عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ -

বল তিনিই আমার রব্ব্— মালিক ও প্রভু। তিনি ব্যতীত আর কেহ মা'বুদ নাই। তাঁহার উপরই আমার একান্ত ভরসা, আমি তাঁহার দিকে ফিরিয়া যাইতেছি। (সূরা রা'দ ঃ ৩০)

অপর এক স্থানে বলা হইয়াছে ঃ

قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ - فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ -

বল হে নবী! আমার নিকট এই মর্মে ওহী পাঠানো হইয়াছে যে, তোমাদের মা'বুদ— সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও মালিক মাত্র একজন। তোমরা কি তাঁহার অধীন ও অনুগত হইয়া থাকিবে? (সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৮)

এই আয়াতে আরও বিশদভাবে বলা হইয়াছে ঃ

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَىَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ - فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَيُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا -

বল, হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ। কিন্তু আমার নিকট এই ওহী নাযিল হইয়া থাকে যে, তোমাদের মা'বুদ মাত্র একজন। অতএব যে ব্যক্তি সেই এক মা'বুদের সাক্ষ ও সন্তুষ্টি পাওয়ার আশা করে, তাহার পক্ষে (সেই এক মা'বুদের নির্দেশ মত) সৎকাজ করা কর্তব্য এবং সে যেন তাহার

'একমাত্র ইলাহ' মানিয়া লইলে বিরুদ্ধবাদীদের সম্মুখে কত বড় বিপদ ঘনীভূত হইয়া আসে।

প্রকৃত ইলাহ্

কুরআন শরীফের প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় প্রকৃত আল্লাহ্‌র পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাহা হইতে আরবী 'ইলাহ' (إله) শব্দের ব্যাখ্যা জানিতে পারা যায়। কিন্তু কুরআনের সেই আয়াতগুলি উদ্ধৃত করিয়া সেই সবগুলির অর্থ লিখিতে গেলে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হইয়া যাইবে। তাই এখানে আমরা সব আয়াতের শুধু সার-কথা লিখিয়া দিতেছি। এখানে কুরআনের সেই আয়াতগুলি সম্মুখে রাখিয়া যাহা লিখা হইল, তাহাই প্রকৃত আল্লাহ্‌র পরিচয় এবং তাহাই 'ইলাহ' শব্দের আসল অর্থ।

আল্লাহ তথা প্রকৃত 'ইলাহ' জীবনদাতা মৃত্যুদাতা। তিনি সমস্ত জীবকে লালন-পালন ও রিযিক দান করেন। তিনিই প্রার্থনা শ্রবণকারী ও শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনকারী। নষ্ট ও ক্ষয়প্রাপ্ত জিনিসকে তিনিই আবার নূতন করিয়া গড়িতে পারেন। প্রাকৃতিক জগতে একমাত্র তাঁহারই হুকুম ও আইন চলে। তিনিই সকল কাজের মূল কর্তা। তাঁহারই উপর একান্তরূপে ভরসা করিতে হয়। তিনিই নিরাশার আশা; বিপদে-আপদে সব সময় কেবল তাঁহারই রহমতের আশা করা যায়। মানুষের লাভ-লোকসান, ক্ষতি-উপকার কেবল তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে হইয়া থাকে। দৃশ্য-অদৃশ্য, জানা-অজানা সব কিছুই তিনি ভাল করিয়া জানেন। তিনি সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী এবং সকলের উপর জয়ী। তিনি সব রকম শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্বের একমাত্র মালিক। তিনি সর্ব প্রকার দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে; কোন ভুল-ভ্রান্তি বা পাপ-অপরাধ তাঁহার নাই। তিনি সারে জাহানের একচ্ছত্র মালিক; সমস্ত বিশ্ব-সাম্রাজ্যের তিনিই প্রকৃত সম্রাট, শাহানশাহ ও রাজাধিরাজ। দুনিয়ার যাবতীয় ধন-সম্পদ ও সম্পত্তির প্রকৃত ও নিরংকুশ মালিক তিনিই। তিনি সমগ্র বিশ্বলোককে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নিজের চালু করা প্রাকৃতিক নিয়ম-বিধানের ভিত্তিতে নিজেই উহা পরিচালনা করিতেছেন। তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবন পরিচালনার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান দিয়াছেন। অতএব মানুষের কর্মজীবনে তাঁহার আদেশ নির্দেশই একমাত্র পালনযোগ্য আইন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সব ব্যাপারে কেবল তাঁহারই আদেশ ও নিষেধ মাথা নত করিয়া মানিতে এবং পালন করিয়া চলিতে হইবে। তাঁহার কোন ক্ষয়-ক্ষতি নাই; তিনি অবিনশ্বর, অক্ষয় ও চিরঞ্জীব। তিনি সব সময় বর্তমান ছিলেন, আছেন এবং থাকিবেন। তাঁহার নিকট ভূত-ভবিষ্যত বা বর্তমান বলিতে কিছুই নাই; সমস্ত কালই তাঁহার নিকট সমানভাবে বর্তমান। তাঁহার কথা ও আদেশের কোন নড়চড় নাই। তাহার কোন ইচ্ছার ব্যতিক্রম করিবার বা তাঁহার সিদ্ধান্তের বিপরীত করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। ভয় করিবার যোগ্য একমাত্র তিনিই; অন্য কাহারও দাসত্ব বা নিরংকুশ আনুগত্য

লাভের অধিকার নাই। এই সমস্ত ব্যাপারে তাঁহার কেহ শরীক নাই; তিনি এক ও একক। তাঁহার মর্জির বিরুদ্ধে কথা বলিতে পারে এমন কেহ নাই। তিনি নিজ ইচ্ছামতই কাজ করেন— কাহারও কথা, দো'আ বা সুপারিশ মানিতে তিনি এতটুকু বাধ্য নহেন। তিনি কাহারও উপর নির্ভরশীল নহেন, কাহারও মুখাপেক্ষীও তিনি নহেন; বরং সারে জাহানের সব কিছু কেবল তাঁহারই মুখাপেক্ষী— কেবল তাঁহারই উপর নির্ভরশীল। তাঁহার রহমত না হইলে কাহারও এক মুহূর্তকাল বাঁচিবার উপায় নাই।

'ইলাহ্' সম্পর্কে জাহিলী মতবাদ

উপরে সংক্ষেপে ইলাহ তথা আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয় দেওয়া হইল। এই পরিচয় এতৎসম্পর্কিত মাত্র কয়েকটি আয়াতের সারমর্ম। নতুবা আল্লাহ্‌র পরিচয় লিখিয়া শেষ করার ক্ষমতা কোন মানুষেরই নাই। কিন্তু যাহা লিখা হইয়াছে তাহা হইতে আল্লাহ্‌র যে প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়— উহাই তাঁহার আসল সিফাত ও গুণ। কিন্তু দুনিয়ার মুশরিক লোকেরা আল্লাহ্‌র এই আসল পরিচয় এবং আসল গুণাবলী ভুলিয়া গিয়া নিজেদের খামখেয়াল অনুসারে আল্লাহ্ সম্পর্কে অমূলক কতকগুলি ধারণা রচনা করিয়া লইয়াছে। আল্লাহ্‌র আসল পরিচয় না পাইয়া তাহারা যে কিভাবে সত্য ও শান্তির পথ ভুলিয়া গিয়াছে এবং প্রত্যেক পদে পদে আঘাত খাইয়াছে, কুরআন হইতে সংক্ষেপে আমরা উহার বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

মুশরিকগণ একমাত্র সাহায্যদাতা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলিয়া গিয়া অন্য শক্তির নিকট সাহায্য ভিক্ষা করে ঃ

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ –

আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া তাহারা অন্য শক্তিকে 'ইলাহ' বানাইয়া লইয়াছে এই আশায় যে, সম্ভবত তাহার নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া যাইবে। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৭৪)

কার্যসিদ্ধির জন্য তাহারা মৃত মানুষকে ডাকে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ وَّمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ –

আল্লাহ্ ব্যতীত তাহারা আর যাহাদের (প্রভু মনে করিয়া) ইবাদত করে, তাহারা একটি জিনিসও সৃষ্টি করিতে পারে না; বরং তাহাদিগকেই আর একজন সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহারা মৃত— জীবিত নয়। তাহারা এতটুকুও জানে না যে, তাহাদের কোন্ দিন কোন্ সময় পুনরুজ্জীবিত করা হইবে।

তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভ করার উদ্দেশ্যে তাহাকে বাদ দিয়া অন্য শক্তির দাসত্ব করে ঃ

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاۤءَ مَانَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى –

যাহারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য শক্তিকে মনিব ও পৃষ্ঠপোষক হিসাবে গ্রহণ করে এবং বলে যে আমরা কেবল এই উদ্দেশ্যে তাহাদের ইবাদত করি যে, তাহারা আমাদিগকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করিয়া দিবে। অর্থাৎ তাহারা প্রকৃত আল্লাহ্র নিকট পৌঁছিবার জন্য কৃত্রিম আল্লাহ্ বনাইয়া লয়। (সূরা যুমার ঃ ৩)

তাহারা আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করাইবার জন্য অন্য শক্তির ইবাদত করে ঃ

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَاۤءِ شُفَعَاۤؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ –

তাহারা আল্লাহ্ ছাড়া এমন সব জিনিসের উপাসনা করে, তাহাদের উপকার বা ক্ষতি করিবার কোন ক্ষমতাই যে সবের নাই। তাহারা বলে যে, ইহারা আমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করিবে। (সূরা ইউনুস ঃ ১৮)

ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তাহাদের ধারণা হইল, সরাসরিভাবে আল্লাহ্র নিকট পৌঁছা যাইবে না। আল্লাহ্র নিকট পৌঁছিতে হইলে কৃত্রিম উপাস্যদিগকে মাধ্যম ধরিতে হইবে।

তাহারা চন্দ্র এবং সূর্যের পূজা করে। মনে করে, দিন-রাত, চন্দ্র ও সূর্য বিস্ময়কর জিনিস, ইহারা উপাস্য না হইয়া পারে না। অথচ চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহ্রই সৃষ্ট এবং তাঁহার অস্তিত্ব এবং একত্বের নির্দশন মাত্র। আল্লাহ্ বলিতেছেনঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ–لَاتَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَالِلْقَمَرِ –

রাত ও দিন, চন্দ্র এবং সূর্য আল্লাহ্র অস্তিত্ব এবং একত্বের নিদর্শন; অতএব কি চন্দ্র কি সূর্য— ইহার কোনটিকেই সিজদা (পূজা-উপাসনা) করিও না; কেননা এইগুলিতো প্রকৃত আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও অসীম কুদরতের প্রমাণ। এইগুলিকে সিজদা করিয়া তো কিছুই লাভ হইবে না।
(সূরা হা-মীম আস্ সিজদাহ ঃ ৩৭)

তাহারা আলেম, পীর ও পণ্ডিতদের দাসত্ব করে; তাঁহারা যাহাই বলে তাহারা ন্যায়-অন্যায় বিচার না করিয়া তাহাই পালন করে। অন্ধভাবে এইরূপ কোন মানুষের আনুগত্য করা ও নির্বিচারে হুকুম পালন করিয়া চলা শির্ক। কারণ মানুষ আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারও হুকুম নির্বিচারে পালন করিলে তাহাকেই আল্লাহ্র মর্যাদা দান করা হয়। আল্লাহ্ তাহাদের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন ঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ–

তাহারা আল্লাহ্ তা'আলাকে বাদ দিয়া তাহাদের আলেম, পীর, পণ্ডিত ও সরদার লোকদিগকে নিজেদের 'রব্ব্' বা প্রভু বানাইয়া লইয়াছে।
(সূরা তওবা ঃ ৩১)

বিপদ হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য কিংবা প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তাহারা মানুষকে ডাকে। এইরূপ ডাকা আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এবং ইহাও শির্কের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এইরূপ উদ্দেশ্যে ডাকিতে হইবে কেবলমাত্র আল্লাহ্কে। বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ –

আল্লাহ্কে ছাড়িয়া তোমরা যাঁহাদিগকে (বিপদ মুক্তির জন্য) ডাক তাহারা তোমাদেরই মত (অক্ষম) বান্দাহ্ বই তো নয় অতএব, (তাহারা সত্যই তোমাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে বলিয়া মনে করিয়া থাক, তবে) তাহাদের নিকট দো'আ করিয়াই দেখ, তাহারা তোমাদের প্রার্থনার জওয়াব দান করুকনা, তাহাদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা যদি সত্যই হয়।
(সূরা আ'রাফ ঃ ১৯৪)

তাহারা এক আল্লাহ তা'আলার বিধান ত্যাগ করিয়া মনের ইচ্ছামত কাজ করে— ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ এবং পাপ-পূণ্য কিছুরই বিচার করে না।

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ– اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا –

যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির কামনাকে 'প্রভু' বানাইয়া লয় (কেবল প্রবৃত্তির ইচ্ছামত কাজ করে) তাহার অবস্থা কি তুমি দেখনা? তথাপি কি তাহার দায়িত্ব তুমি গ্রহণ করিবে? (সূরা আল-ফুরকান ঃ ৪৩)

এখানে যে আয়াতগুলি উল্লেখ করা হইল, একটু গভীরভাবে সেইগুলির অর্থ চিন্তা করিলে খুব সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, দুনিয়ার একদল মানুষ এক আল্লাহ্কে 'ইলাহ' ও 'রব্ব' স্বীকার না করিয়া, নিজের প্রবৃত্তির কামনা, ক্ষমতাবান মানুষ, বাতিলপন্থী পীর-দরবেশ ও ধর্মগুরু, চন্দ্র-সূর্য এবং নিষ্প্রাণ দেব-দেবীকে বাস্তবিকই 'খোদা' বা 'প্রভু' বানাইয়া লইয়াছে আর তাহাদের দাসত্ব, গোলামী, পূজা-উপাসনা ও হুকুম বরদারী করিতেছে। কিন্তু সারে জাহানের সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহ্র অস্তিত্ব গুণ-বৈশিষ্ট্যকে তাহারা কেহই সম্পূর্ণ অস্বীকার করে নাই; কেহই কখনও এই কথা বলে নাই যে, সৃষ্টিকর্তা নাই বা তাঁহার কোন গুণ-বৈশিষ্ট্য নাই। আসলে তাহারা আল্লাহ্কেই সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমান ও সর্বপ্রধান হুকুমদাতা বলিয়া মানিত, কিন্তু তাহাদের আকীদার মধ্যে মূল দোষ ছিল এই যে, তাহারা সেই সঙ্গে আল্লাহ্র সৃষ্ট জীবদের মধ্যে ফেরেশতা, জ্বিন, মানুষ, দেব-দেবী, চন্দ্র-সূর্য-তারকা ইত্যাদিকেও আল্লাহ্ তা'আলার কাজে তাঁহার

অংশীদার, সাহায্যকারী বা অনুরূপ শক্তির আধার বলিয়া মানিত। বিপদের সময় ইহাদের নিকট আশ্রয় চাহিত; কঠিন কোন কাজ সমাধা করার জন্য ইহাদের নিকট শক্তি প্রার্থনা করিত। মনে করিত যে, ইহাদেরও কিছু না কিছু ক্ষমতা আছে। প্রকৃত আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করার জন্য প্রকৃত আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও রহমত পাওয়ার জন্য এবং প্রকৃত আল্লাহ্‌র নিকট সুপারিশ করাইবার জন্য তাহারা এই সবের দাসত্ব ও পূজা করিত। এইগুলির জন্য তাহারা মানত মানিত এবং ইহারাও মানুষের কোন ক্ষতি বা উপকার করিতে সক্ষম— এই ধারণায় ইহাদিগকে ভয়ও করিত। আর একটি বড় দোষ এই ছিল যে, তাহারা আল্লাহ্‌র বিধান ছাড়াও নিজেদের মনের কামনা-বাসনা এবং নিজেদের তথাকথিত পীর-দরবেশ ও নেতৃবৃন্দের কথা দ্বারা হালাল হারাম ঠিক করিত। তাহারা একথা চিন্তা করিত না বা কাহারও নিকট জিজ্ঞাসাও করিত না যে, এই ব্যাপারটি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম কি? আল্লাহ্‌র নিকট ইহা হালাল না হারাম? তাহারা শুধু এইটুকুই জানিতে চাহিত যে, কাংক্ষিত জিনিসটিকে তাহাদের (বাতিল) পীর দরবেশ বা নেতারা পসন্দ করেন, না অপসন্দ করেন, হালাল বলেন কিংবা হারাম মনে করেন? এই ব্যাপারে মনঃপুত ইঙ্গিত পাইলে অমনি তাহারা সেই অনুসারে কাজ করিত।

যাবতীয় ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই মানুষকে তাহা দান করিয়াছেন, এই কথার প্রতি বিশ্বাস রাখিয়াও তাহারা নিজদিগকেই এই সবের (ধন-সম্পদের) নিরংকুশ মালিক মনে করিত এবং নিজেদের ইচ্ছামতই তাহা উপার্জন ও ব্যয়-ব্যবহার করিত।

কালেমা তাইয়্যেবার বিরোধিতা করার মূল কারণ

আল্লাহ্ সম্বন্ধে দুইটি ধারণা আমরা পাশাপাশি উল্লেখ করিলাম। প্রথমটি প্রকৃত আল্লাহ্‌র পরিচয়, আর অপরটি 'আল্লাহ্' সম্পর্কে দুনিয়ার জাহিল ও মুশরিক লোকদের ধারণার ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়ার পর এই কথা বুঝিতে কাহারও অসুবিধা হইবে না যে, দুনিয়ার ইতিহাসে যখনই এবং যাহারই মুখে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ) এর আওয়াজ বুলন্দ হইয়াছে, তখনই সেই সমাজের গুমরাহ লোকেরা এবং তথাকার বাতিলপন্থী রাষ্ট্রপতি, পুঁজিপতি ও ধর্মপতিরা উহার বিরুদ্ধে সকল শক্তি নিয়োজিত করিয়া উহাকে অংকুরেই বিনষ্ট করিতে যারপর নাই চেষ্টা করিয়াছে কেন? এ কালেমা শুনিয়াই তাহারা কেন একেবারে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং বহু দিনের বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী লোকদের সহিত প্রকাশ্য শত্রুতা করিতে তাহারা কেন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে?

আসল ব্যাপার এই যে, এই কালেমার আওয়াজ যখনই যে-দেশে (নূতন করিয়া) বুলন্দ হইয়াছে, সে দেশের লোকেরা অমনি তাহা শুনিয়া পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছে, ইহার অর্থ এবং ইহার অন্তর্নিহিত ভাবধারা কি। তাহারা বুঝিয়াছে, এই কালেমাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস ও কবুল করিলে এবং এই

কালেমা অনুসারে নিজেদের জীবন ঢালিয়া তৈয়ার করিলে কিংবা এই কালেমার শিক্ষা প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে কোথায় কোথায় আঘাত লাগে— কোন্ কোন্ স্বার্থ, বিশ্বাস বা নিয়ম-পদ্ধতিকে অসংকোচে পরিত্যাগ করিয়া নূতন শিক্ষা নূতন বিশ্বাস ও নূতন নিয়ম-পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হয়। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, কোন সমাজে এই কালেমা উচ্চারিত ও প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সমাজের লোকেরা নীতির দিক দিয়া দুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে ঃ একদল এই কালেমাকে বুঝিয়াছে, অন্তর দিয়া বিশ্বাস ও কবুল করিয়াছে, মুখে উচ্চারণ ও প্রচার করিয়াছে এবং সমগ্র জীবন দিয়া জীবনের প্রত্যেকটি কর্মের ভিতর দিয়া এই কালেমার আদর্শ রূপায়িত করিয়াছে, ইহার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছে।

আর একদল লোক এই কালেমার অর্থ বুঝিয়াছে এবং বুঝিয়া ইহাকে অংকুরেই বিনষ্ট করিবার জন্য, ইহার আওয়াজ অন্য কোন মানুষের কানে যেন না পৌঁছিতে পারে— সেই জন্য নিজেদের সর্বশক্তি লাগাইয়া ও যথাসর্বস্ব ব্যয় করিয়া চেষ্টা করিয়াছে। তাই এই কালেমা যেমন মানব সৃষ্টির আদি হইতেই চলিয়া আসিয়াছে, তেমনি ইহার বিরোধিতাও সেই সময় হইতেই হইয়া আসিয়াছে। এই জন্য 'মুসলিম' ও 'কাফির' দুইটি শব্দ বা মানুষের দুইটি দল আদিকাল হইতে সমানভাবে চলিয়া আসিয়াছে। এই দুই দলের মধ্যে যে লড়াই, তাহা নীতি ও আদর্শের লড়াই এবং এই লড়াইয়ের ইতিহাসই হইতেছে কালেমা তাইয়্যেবার ইতিহাস। ইসলামের পরিভাষায় এই লড়াইকেই বলা হয় 'জিহাদ'।

কালেমা তাইয়্যেবার শিক্ষা

মোটকথা, 'কালেমা তাইয়্যেবা' একটি বিরাট বিপ্লবী ঘোষণা। যাহারা ইহা গ্রহণ করে, তাহারা আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারও ইবাদত, বন্দেগী বা উপাসনা করিতে পারে না; আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করিবার জন্য কিংবা তাঁহার নিকট সুপারিশ করাইবার আশায় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও ইবাদত ও দাসত্ব অথবা হুকুমবরদারী করিতে পারে না। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ এবং তাঁহার আযাব হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাহারা আল্লাহ্‌রই হুকুম-আহকাম পালন করা ছাড়া কোন মানুষকে— রাষ্ট্রপতি, নেতা-নেত্রী বা পীর-বুযর্গকে এবং ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন পন্থা ও পদ্ধতি কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারে না। তাহারা মনে করে— অন্তরের সহিত বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্‌র রহমত ও সন্তুষ্টি এবং তাঁহার নৈকট্য লাভের জন্য অন্তরের অন্তস্থল দিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া একমাত্র মা'বুদরূপে তাঁহাকেই মানিয়া লইয়া তাঁহারই নির্দেশমত জীবন যাপন করা এবং তাঁহারই বিধানকে দুনিয়ার বুকে পুরাপুরি কায়েম করার জন্য 'জিহাদ' করাই হইতেছে একমাত্র উপায়। এই উপায় ও পন্থা ভিন্ন অন্য কোন পন্থা যাহারা প্রচার করে, যাহারা বলিয়া বেড়ায় যে, "আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করিতে হইলে অমুক দরবেশ,

অমুক পীর-বুযর্গের নিকট মুরিদ হইয়া বা তাহার মাযারে হাযির হইয়া ফায়েজ-তাওয়াজ্জুহ হাসিল করিতে হইবে, নতুবা তাঁহার বদ্‌দো'আয় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে" অথবা যাহারা "শুধু কুরআন-হাদীস অনুযায়ী আমল করাই আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য যথেষ্ট নয়" বলিয়া প্রচার করে, তাহারা প্রকারান্তরে শির্‌কেরই প্রচার করে। কারণ পীর সাহেবান ও বুযর্গানে দ্বীনের রূহানী শক্তির নিকট কোন কিছুর আশা করা বা তাহাকে ভয় করা পরিষ্কার শির্‌ক। কালেমা তাইয়্যেবার প্রতি যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা কখনই সেই দাওয়াত শুনিতে প্রস্তুত নয়। তাহারা সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলিয়া উঠিবে যে, 'আল্লাহ্ তা'আলার রহমত লাভের জন্য তাঁহাকেই ডাকিব, কেবল তাঁহারই গোলামী করিব, তাঁহার নিষিদ্ধ কাজ ও পথ ত্যাগ করিব এবং তাহা দুনিয়া হইতে মুছিয়া ফেলার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব। কেননা শাফা'আত করার ক্ষমতা এবং সারে জাহানের উপর কর্তৃত্ব কেবল এক আল্লাহ্‌র।[১] তাহারা বলিবে, মানুষের ক্ষতি বা উপকার করিবার ক্ষমতা আল্লাহ্ ছাড়া কাহারও আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। কোন জীবিত বা কবরে শায়িত ব্যক্তির এই ক্ষমতা আছে বলিয়া আমরা মানি না। বস্তুত ইহাই হইতেছে প্রকৃত তওহীদবাদী মানুষের কথা এবং এই পথই হইতেছে তওহীদবাদী মানুষের জন্য একমাত্র জীবন-পথ।

এই কথাই বলা হইয়াছে কুরআনের এই আয়াতটিতে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

হে ঈমানদার বান্দাগণ! আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর এবং তাঁহারই নৈকট্য লাভ করিবার উপায় তালাশ কর এবং এই লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিতে থাক সম্ভবতঃ (এই উপায়ে) তোমরা সফলকাম হইতে পারিবে।[২]

(সূরা মায়িদাহ ঃ ৩৫)

এই কালেমার অর্থ ঃ আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই। অতএব প্রভুত্ব ও

---

১. قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ বল শাফা'আত সম্পূর্ণভাবে এক আল্লাহ্‌র ক্ষমতাধীন। আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মালিকানা ও কর্তৃত্ব কেবল তাঁহারই। অতপর সকলকে তাঁহারই নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে।

২ মওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ) এই আয়াতের টীকায় লিখিয়াছেনঃ "কোন কোন জাহিল সুফী এই আয়াত দ্বারা পীর ধরা ফরয প্রমাণ করিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাহা সত্য নয়।" বস্তুত এই আয়াত দ্বারা যাহারা পীর-ধরা ফরয প্রমাণ করিতে চাহে, তাহাদের ধৃষ্টতা অমার্জনীয়। কেননা কুরআনের কোথাও 'অসীলা' শব্দের অর্থ পীর নহে। ইমাম রাগেব ইসফাহানী তাঁহার 'মুফরাদাতে রাগেব ইছফাহানী' গ্রন্থে 'আল-অসীলা' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন— 'কোন জিনিস পর্যন্ত পৌঁছা'। পূর্ণ আয়াতের অর্থ হইবে— ইল্‌ম, ইবাদত ও মহৎ কাজ সহকারে সত্য ও সঠিক পথে চলিতে থাকা।

সার্বভৌমত্বের অধিকারী কেবলমাত্র আল্লাহ্ই, তিনি ছাড়া আর কেহই নয়। অতএব আইন ও বিধানদাতাও কেবলমাত্র তিনিই।

অতএব যে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে না, কালেমা বিশ্বাসী কোন মানুষই উহার আনুগত্য করিতে পারে না; এমন রাষ্ট্রের জারি করা কোন আইন-কানুনও সে মানিয়া লইতে রাজী হইতে পারে না।

বস্তুত কালেমা তাইয়্যেবা'র প্রতি যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিবে, তাহারা খালেস ইসলামী হুকুমত ভিন্ন অন্য কোন রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিতে পারে না, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব মানিয়া লইতে এবং তাহা সমর্থন করিতে পারে না। মানুষেব রচিত কোন আইন-কানুনও তাহারা মানিতে পারে না। যে আদালতে মানুষের রচিত আইনের ভিত্তিতে বিচার হয়, সে আদালতের নিকট তাহারা কোন বিচারও চাহিতে পারে না এবং মানুষের রচিত কোন আইন লইয়া তাহারা ওকাল তিও করিতে পারে না; কারণ, ইহার প্রত্যেকটি কাজই শির্‌ক এবং ইহা করিতে গেলে মুখে আল্লাহ্‌র স্বীকৃতি থাকিলেও কার্যতঃ তাঁহাকে অস্বীকার করা হয়। কুরআন মজীদের বক্তব্য হইল ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِه - وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيْدًا - وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا -

হে নবী! সেই সব লোক সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, যাহারা একদিকে কুরআন ও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনিয়াছে বলিয়া মনে মনে ধারণা করে আর অপরদিকে আল্লাহ্‌দ্রোহী শক্তির নিকট বিচার ফায়সালা চায়, অথচ সেই আল্লাহ্‌দ্রোহী শক্তিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিবার আদেশই তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল? (ইহারা আসলে মুনাফিক) শয়তান ইহাদিগকে গুমরাহ করিয়া বহুদূরে লইয়া যাইতে চায়। এই জন্য যখন তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র বিধান এবং রাসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন তুমি দেখিবে যে, এই সব মুনাফিক লোক তোমার পাশ কাটাইয়া দূরে সরিয়া যাইতেছে।[১]

(সূরা নিসা ঃ ৬০ ও ৬১)

অর্থাৎ এক আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব ছাড়া আর কাহারও প্রভুত্বকে স্বীকার করা, আল্লাহ্‌র আইনকে বাদ দিয়া মানুষের রচিত আইন অনুসারে

---

১. আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেনঃ "এমন কাজের সাহায্যে আল্লাহ্‌র নৈকট্য সন্ধান করা, যাহাতে তাঁহার সন্তোষ লাভ হইতে পারে।"

বিচার-ফায়সালা করা বা চাওয়া এবং সেই আইন লইয়া ওকালতি করা পরিষ্কার শিরক। তাই যখন ইসলাম-বিরোধী কোন নেতা বা রাজশক্তি মানুষের নিকট আনুগত্য পাওয়ার দাবি করে, তখন তওহীদে বিশ্বাসী মানুষ সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলিয়া উঠে ঃ আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল ও ইসলামী আইনের ভিত্তিতে গড়া রাষ্ট্র এবং আল্লাহ্র আনুগত্য স্বীকারকারী ও তাঁহার আইন অনুসরণকারী রাষ্ট্রপ্রধান ছাড়া আমরা অন্য কাহারও আনুগত্য স্বীকার করিতে পারি না। যখন তাহাদের উপর মানুষের রচিত আইন জারি করা হইবে এবং সে অনুসারে বিচার ফায়সালা করা হইবে, তখন তাহারা উদাত্ত কণ্ঠে জানাইয়া দিবে ঃ আমরা মানুষের রচিত আইন মানি না এবং সে অনুযায়ী কোন বিচারও আমরা চাহি না। যখন দুনিয়ায় ধন-সম্পত্তি, পুঁজি ও উৎপাদন-উপায়কে মানুষের নিজেদের মর্জিমত কিংবা মনগড়া কোন মতাদর্শ বা ব্যবস্থা অনুযায়ী ভোগ-ব্যবহার ও ব্যয়-বন্টনের চেষ্টা করা হইবে, তখন তাহারা স্পষ্ট ভাষায় বলিবে যে, সারে জাহানের নিরংকুশ মালিক হইতেছেন একমাত্র আল্লাহ্। যাবতীয় ধন-সম্পদ ও উপায়-উৎপাদনেরও প্রকৃত মালিক তিনিই। অতএব একমাত্র আল্লাহ্রই মর্জী ও তাঁহারই দেওয়া ব্যবস্থা অনুযায়ী তাহা ভোগ-দখল ও ব্যবহার করিতে হইবে।

এইভাবে কালেমা তাইয়্যেবায় বিশ্বাসী মানুষের জীবনে ধীরে ধীরে আমূল পরিবর্তনের সূচনা হয়। বিপদের সময় সে আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহাকেও ডাকে না। কোন দেব-দেবীকে নয়, কোন পীর-বুযর্গকে নয়, কোন অলৌকিক শক্তি, কোন রাজা-বাদশাহ বা কোন নেতাকেও নয়।[১] সে এই কালেমা পড়িয়া, বিশ্বাস করিয়া সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইবে— উহার মধ্যে যাহাই এই কালেমার বিরোধী বা বিপরীত বলিয়া প্রমাণিত হইবে, সে অমনি উহার

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে এবং যতদিন পর্যন্ত তাহা চুরমার করিয়া এই কালেমার অনুরূপ নীতি ও ব্যবস্থা কায়েম করিতে না পারিবে, ততদিন সে অবিশ্রান্তভাবে সে জন্য চেষ্টা-সাধনা এবং লড়াই-সংগ্রাম করিয়া যাইবে।

হযরত ইবরাহীম (আ) ঠিক তাহাই করিয়াছিলেন। কুরআনের ভাষায় তাঁহার ঘোষণা ছিল ঃ

انَّا بُرَءٰٓؤُامِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ -

১. কোন চিকিৎসককে ডাকিলে ও তাহার ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ ব্যবহার করিলেও চিকিৎসক বা ঔষধই তাহার রোগ সারিয়া দিবে এই কথা সে আদৌ মনে করিবে না; বরং মনে এই বিশ্বাস অবিচল রাখিবে যে, প্রকৃতপক্ষে রোগ সারিবেন তো আল্লাহ্ই। তবে এইগুলির ব্যবহার করিতেছি কেবল তাঁহার নির্দেশ পালনের জন্য।

আমরা তোমাদের ও তোমাদের সেই মা'বুদদের— আল্লাহ্কে বাদ দিয়া তোমরা যাহাদের ইবাদত কর— সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিলাম, সব দায়িত্ব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইলাম। আমরা তোমাদের সব কর্তৃত্ব অস্বীকার ও অমান্য করিলাম এবং এই মুহূর্ত হইতে আমাদের ও তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও ঘৃণা স্পষ্টভাবে শুরু হইয়া গেল চিরদিনের তরে। যতদিন তোমরা এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমানদার ও তাঁহারই অনুগত না হইবে ততদিন পর্যন্তই ইহা স্থায়ী থাকিবে। (সূরা মুমতাহিনা ঃ ৪)

বস্তুত তওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তির ইহাই ঘোষণা। কোনদিনই ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে এই ঘোষণাকারীই প্রকৃত 'বিদ্রোহী' এবং 'বিপ্লবী'— তওহীদবাদী অর্থাৎ এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী।

এই কালেমার জন্য প্রয়োজন হইলে তওহীদবাদী মানুষকে নিজের যথাসর্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে। কালেমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত একজন মানুষ থাকে স্বাধীন ও যথেচ্ছাচারী— নিজের মনে যাহা আসে অবাধে সে তাহাই করে, করিতে পারে; কিন্তু এই কালেমা পাঠ করার পর তাহার সেই স্বাধীনতা আর থাকে না। ইহার পর তাহাকে প্রত্যেকটি কাজই চিন্তা করিয়া করিতে হইবে এবং যখনই কোন নিষিদ্ধ কাজ সম্মুখে আসিবে, অমনি তাহা হইতে নিজেকে বিরত রাখিতে হইবে। অন্য কথায়, যতদিন সে আল্লাহ্র গোলামী হইতে আযাদ বা স্বাধীন ছিল, ততদিনই সে ছিল প্রকৃতপক্ষে গোলাম—প্রবৃত্তির গোলাম, দেশ-চলতি প্রথা ও মানব রচিত আইনের গোলাম এবং পীর-মুরশিদ ও নেতৃবৃন্দের গোলাম। কিন্তু যখনই সে পড়িলঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' অমনি এই সকলের গোলামীর শিকল তাহার গলদেশ হইতে ছিন্ন হইয়া পড়িয়া গেল এবং কেবল আল্লাহ্ তা'আলার গোলামী কবুল করার ফলে সে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিল। ইসলামে ইহারই নাম সত্যিকার স্বাধীনতা।

এক্ষণে যাহাদের প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের উপর, যাহাদের পীরগিরি, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের উপর এবং যাহাদের ধন-মাল, মনগড়া অর্থনীতি, রাষ্ট্রীয় গদি ও সমাজ ব্যাবস্থার উপর এই কালেমার প্রত্যক্ষ আঘাত পড়ে, তাহারা যদি কালেমাকে গ্রহণ না করে এবং উহার বিরোধী সবকিছু অকাতরে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত না হয়, তবে তাহারা যে এই কালেমার বিরোধিতা করিতে বদ্ধপরিকর হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? যাহাদের মনে সত্যের পিপাসা ছিল, তাহারা সত্য পাইয়া তাহা গ্রহণ করিল। অন্য লোকদের মধ্যে কেহ মূর্খতাবশত আর কোন কোন লোক স্বার্থ ও অহমিকার বশবর্তী হইয়া এই কালেমার প্রকাশ্য দুশমনী করিতে শুরু করিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে আম্বিয়ায়ে কিরামের যত বিরোধিতা ও দুশমনী করা হইয়াছে, এই কালেমাই হইতেছে উহার মূল কারণ।

দ্বিতীয় অংশের ব্যাখ্যা

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

কালেমা তাইয়্যেবার প্রথম অংশ 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্'র অর্থ এবং উহার ব্যাখ্যা যথাসম্ভব সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল। ইহা বুঝিয়া লওয়ার পর কালেমার শেষ অংশ অর্থাৎ 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র অর্থ বুঝিতে বিশেষ অসুবিধা হইবে না। এই অংশের সহজ অর্থ হইতেছেঃ 'হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল'।

তওহীদের যে ব্যাখ্যা আমরা উপরে করিয়াছি, তাহা স্বীকার করিয়া লইলে জীবনে প্রত্যেকটি কাজ এবং প্রত্যেকটি পদে পদে আল্লাহ্র হেদায়েত ও আইন অনুযায়ী চলা আমাদের একান্ত কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। শুধু ইহাই নয়, আল্লাহ্র আইন ছাড়া আমরা আর কিছুই মানিতে ও অনুসরণ করিতে পারি না এবং কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই আমাদের সারা জীবন কাজ করিয়া যাইতে হয়। ইবাদাত-বন্দেগী, রাজনীতি ও রাষ্ট্র-পরিচালনা, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব, শিক্ষা-দীক্ষা, লেন-দেন ও বেচা-কেনা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, যুদ্ধ-সন্ধি, বন্ধুতা-শত্রুতা— মোটকথা ব্যক্তি জীবন ও সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি কাজই কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও আইন অনুযায়ী সমাধা করা একান্তই আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু এখন মুশকিল এই দাঁড়ায় যে, আমরা আল্লাহ্র আইন কোথায় পাইব এবং কেমন করিয়া জানিব যে, আল্লাহ্ কোন্ কাজে সন্তুষ্ট হন আর কোন্ কাজে অসন্তুষ্ট হন? জীবন যাপনের কোন্ পন্থা এবং ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'আলা পসন্দ করেন আর কোন্‌টি করেন অপসন্দ, তাহাই বা আমরা বুঝিতে পারিব কিরূপে? আর ইহা যতক্ষণ পর্যন্ত জানিতে ও বুঝিতে না পারিব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যতই তওহীদ বিশ্বাসী হই না কেন, সেই তওহীদ অনুযায়ী কাজ করিতে আমরা কোনদিনই পারিব না। এইখানে আরও একটি ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ। বড় বড় ও মহামূল্য নীতিকথা বলার লোক দুনিয়ায় কোন দিনই কম পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই নীতি নিজে অনুসরণ করিয়া উহা বাস্তবায়িত করার পন্থা দেখাইয়া দেওয়ার লোক খুব বেশী কোনদিনই পাওয়া যায় নাই। তাই কালেমার প্রথম অংশের প্রতি বিশ্বাসী লোকদের জন্য নেতা বা পথ-প্রদর্শক হিসাবে একান্ত প্রয়োজন এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি নিজে পুতঃপবিত্র চরিত্রের অধিকারী হইয়া এবং আল্লাহ্র বিধান নিজে পালন করিয়া লোকদিগকে উহা অনুসরণ করার বাস্তব পন্থা দেখাইয়া দিবেন। এইরূপ নেতৃত্ব না পাইলে মানুষের পক্ষে আল্লাহ্র বিধান পালন করা সম্ভব নয় আর তাহা না পাইলে কোনদিনই আমরা শান্তি ও কল্যাণ লাভ করিতে সমর্থ হইব না। কালেমা তাইয়্যেবার প্রতি আমাদের ঈমানও আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত হইতে পারিবে না। ফলে তাহা আমাদের জন্য অত্যন্ত মর্মান্তিক পরিণতি লইয়া আসিবে। ইহা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

নবীর প্রয়োজনীয়তা

ব্যাপারটি সত্যিই একটু ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। আল্লাহ্ যদি কেবল এতটুকু বলিয়া দিতেন যে, তোমরা কেবল আমারই আইন ও সন্তুষ্টি অনুযায়ী কাজ কর, মানুষের রচিত কোন আইন বা মনগড়া কোন পন্থা তোমরা স্বীকার করিও না—তাহা করিলে তোমরা মুশরিক হইয়া যাইবে এবং মুশরিকদের জাহান্নামে না গিয়া উপায় নাই আর সেই সঙ্গে যদি তিনি (আল্লাহ্ তা'আলা) আইন ও বিধান নাযিল না করিতেন এবং মানুষকে না জানাইয়া দিতেন যে, এই কাজে আমার সন্তুষ্টি আর এই কাজ আমি পসন্দ করি না, তাহা হইলে এই অক্ষম মানব জাতির দুর্গতি এবং দুর্ভাগ্যের কোন অন্ত থাকিত না। আপনাকে যদি কোন উড়োজাহাজের পাইলট করিয়া আকাশ-পথে ঢাকা হইতে জেদ্দা যাওয়ার জন্য ঐ জাহাজে বসাইয়া দেওয়া হয়, অথচ আপনি না জানেন উড়োজাহাজ চালাইতে আর না চেনেন জেদ্দা যাওয়ার পথ, তাহা হইলে আপনার যে কতখানি বিপদ হইবে, তাহা আপনি সহজেই বুঝিতে পারিবেন। দুনিয়ার মানুষ এমন নির্বুদ্ধিতা করিলেও করিতে পারে, কিন্তু দয়াময় ও মেহেরবান আল্লাহ্ তা'আলা তাহা কখনও করেন নাই। তিনি যে দিন দুনিয়ার বুকে মানুষ পাঠাইয়াছেন সেইদিন হইতেই তাহার নিকট পার্থিব জীবন পরিচালনার জন্য একটা পরিপূর্ণ বিধানও প্রেরণ করিয়াছেন। এই জীবনক্ষেত্রে কোন্ কাজ কিভাবে সম্পাদন করিতে হইবে তাহা তিনি পরিষ্কার করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে, অমুক অমুক কাজে তাঁহার সন্তুষ্টি আছে আর অমুক অমুক কাজে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছেন যে, অমুক পথে যে চলিবে সে আমার সন্তুষ্টি পাইবে আর অমুক পথে যে চলিবে সে জাহান্নামে জ্বলিতে বাধ্য হইবে। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার প্রদত্ত বিধান কিভাবে বাস্তবায়ন করিতে হইবে তাহা প্রত্যক্ষভাবে দেখাইয়া দেওয়ার জন্য সুযোগ্য উস্তাদ ও পথ-প্রদর্শকের ব্যবস্থাও তিনি করিয়া দিয়াছেন।

ঠিক এই কারণেই আদিকাল হইতে আজ পর্যন্ত দুনিয়ার প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক যুগে লোকদের নিকট আল্লাহ্র এই বিধান লইয়া আসিয়াছেন আম্বিয়ায়ে কিরাম। তন্মধ্যে প্রথম নবী হইতেছেন আদি মানব হযরত আদম (আ) এবং সর্বশেষ নবী হইতেছেন হযরত মুহাম্মাদ (স)। শেষ নবীর ইন্তেকালের পর প্রত্যেক যুগে তাঁহার প্রতিনিধি একদল লোক তাঁহারই পেশকৃত এই 'কালেমা'র প্রচার এবং ইহাকে রাষ্ট্রীয় শক্তির মজবুত ভিত্তিরূপে কায়েম করিতে যত্নবান থাকিবে।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ –

প্রতিটি যুগের গোটা জনগোষ্ঠীর নিকটই আমরা নবী পাঠাইয়াছি (এই বাণী

লইয়া যে,) কেবল আলাহ্ তা'আল্লারই দাসত্ব কর এবং আল্লাহদ্রোহী শক্তিগুলিকে অমান্য কর— অস্বীকার কর। (সূরা নহ্‌ল ঃ ৩৬)

নবীর কাজ

নবীগণ দুনিয়ায় আসেন আল্লাহ্‌র বিধান লইয়া। তাঁহাদের আসার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা কালেমা তাইয়্যেবার প্রথম অংশ— 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বিশ্বাস করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্বীকার করিবে, তাহারা যেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নবীদের প্রদর্শিত নিয়মে ও পন্থায় কাজ করিয়া আল্লাহ্‌র খালেস বান্দাহ্ হইতে পারে। নবীগণ নিজেরাই আল্লাহ্‌র বিধান মত কাজ করিয়া মানুষকে দেখাইয়া দেন। তাঁহারাই ভাল করিয়া জানেন আল্লাহ্‌র বিধান কি এবং কোন্ নিয়মে জীবন যাপন করিলে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হন। নবীগণ ছাড়া মানুষের মধ্যে কেহই তাহা জানিতে পারে না। কাজেই সর্বসাধারণ মানুষের কর্তব্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বিশ্বাস করার পর নবীদের প্রতি ঈমান আনা, পরিপূর্ণরূপে নবীদের আনুগত্য স্বীকার করা এবং আরও একটু অগ্রসর হইয়া ঘোষণা করা— 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'— মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল। ঠিক এই কারণে প্রত্যেক নবীই যেমন দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব ও তওহীদের বাণী প্রচার করিয়াছেন এবং তেমনি লোকদের নিকট তাঁহাদের নিজেদের আনুগত্যেরও দাবি করিয়াছেন।

اِنِّیْ لَکُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْنِ -

আমি তোমাদের প্রতি (আল্লাহ্‌র) বিশ্বস্ত নবী, অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমাকে মানো ও অনুসরণ কর। (সূরা শু'আরা ঃ ১০৭ ও ১০৮)

'বিশ্বস্ত নবী' অর্থ দুনিয়ার মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যে বিধান তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছেন, তাহা তিনি যথাযথভাবে লোকদের নিকট পৌঁছাইয়াছেন এবং বাস্তবে তাহা অনুসরণ ও পালন করিয়া দেখাইয়াছেন। এই আমানতদারীতে তিনি একবিন্দু খিয়ানত বা বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করেন নাই।

আল্লাহ্ নিজেও প্রত্যেক নবীর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করার সুস্পষ্ট আদেশ ও অনুমতি দিয়াছেন ঃ

اَطِیْعُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوا الرَّسُوْلَ-

আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর ও রাসূলের অনুগত্য কর।'

এবং

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ -

যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে সে ঠিক আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করে।

(সূরা নিসা ঃ ৮০)

কারণ নবীগণ নিজেদের ইচ্ছামত বা অন্য কাহারও আদেশ মত কিছুই করেন না। আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে যখন যে আদেশ নাযিল হয়, সর্বপ্রথম নবী তাহাই নিজের কাজের ভিতর দিয়া বাস্তবায়িত করেন।

اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَیَّ -

আমার প্রতি যে ওহী নাযিল করা হয়, আমি কেবল উহারই অনুসরণ করি, উহা ভিন্ন আর কিছুই আমি করি না। (সূরা আন'আম ঃ ৫০)

এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে সর্বোত্তম আদর্শ ও অনুসরণীয় নেতা করিয়া দুনিয়ায় পাঠাইয়াছেন। বলিয়াছেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِیْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا -

নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের ব্যক্তিত্বে সর্বোত্তম আদর্শ রহিয়াছে— তাহাদের জন্য, যাহারা আল্লাহ্ ও পরকালের আশা করে এবং খুব বেশী করিয়া আল্লাহ্‌র স্মরণ করে। (সূরা আহযাব ঃ ২১)

এই সব আয়াত হইতে একথা পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারা যায় যে, খালেসভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত এবং একান্তভাবে তাঁহার আনুগত্য করিবার পথ হইতেছে জীবনের প্রতিটি কাজে কেবল নবীগণের অনুসরণ করা এবং দুনিয়ার আল্লাহ্‌দ্রোহী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করা। বস্তুত নবীর আনুগত্যই হইতেছে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের বাস্তব রূপ।

কালেমার পরিপূর্ণতা

আগেই বলিয়াছি, হযরত আদম (আ) হইতে নবী প্রেরণের যে ধারা চলিয়াছে, তাহা হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছে। এই শেষ নবীর নিকট আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে সর্বশেষ বিশ্বমানবের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য যে বিধানখানি আসিয়াছে, উহার নাম কুরআন শরীফ। এক্ষণে যাহারাই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'— কালেমার এই প্রথম অংশ বিশ্বাস করিবে, উহার শেষ অংশ 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' টুকুও তাহাদের বিশ্বাস করিতে এবং মানিয়া লইতে হইবে। কারণ বর্তমান দুনিয়ায় মানুষের জন্য জীবন যাপনের নির্ভুল ও সুন্দর ব্যবস্থা এবং ইহকাল ও পরকালে তাহার সর্ববিধ সুখ-শান্তি লাভ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে পবিত্র কুরআন ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আদর্শ জীবন। আল্লাহ্‌র শেষ কিতাব হিসাবে কুরআন শরীফ যেমন অপরিবর্তিত অবস্থায় আমাদের নিকট বর্তমান আছে, তেমনি উজ্জ্বল ও স্পষ্টতর তাঁহার হইয়া বর্তমান আছে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর মহত্তম জীবনের প্রতিটি দিক।

তাই 'কালেমা তাইয়্যেবা' এইখানে আসিয়া পূর্ণতা লাভ করিল— 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই অংশের সহিত যুক্ত হইল 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। ইহার ফলে মুহাম্মাদ (স)-ই হইলেন কালেমা বিশ্বাসীদের জন্য চিরন্তন ও চিরকালীন শুভ্র সমুজ্জ্বল আদর্শ নেতা। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ –

হযরত মুহাম্মাদ (স) তোমাদের পুরুষদের কাহারও পিতা নহেন; বরং তিনি আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল এবং সর্বশেষ পয়গাম্বর। (সূরা আহ্যাব ঃ ৪০)

এই ঘোষণা অনুযায়ী হযরত মুহাম্মাদ (স)-ই হইলেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁহার পর আর কোন নবী বা রাসূল আসিবেন না— আসিবার কোন প্রয়োজনই নাই। কেননা মানুষের জন্য যে আইন ও বিধান দরকার, কুরআন মজীদরূপে তাহা তাহাদের নিকট বর্তমান রহিয়াছে এবং যে আদর্শ নেতৃত্বের প্রয়োজন তাহা মুহাম্মাদ (স)-এর ব্যক্তিত্বে চির অম্লান হইয়া রহিয়াছে— থাকিবে চিরকাল, থাকিবে কিয়ামত পর্যন্ত।

শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্র বিধান কুরআন শরীফ অনুযায়ী জীবন যাপন করিয়াছেন এবং দেখাইয়া দিয়াছেন যে, আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী একজন মুসলমানকে কিভাবে জীবন যাপন করিতে হয়। এই কুরআনের ব্যাখা তিনিই দিয়া গিয়াছেন মুখের কথা ও বাস্তব কাজ দ্বারা। উহার পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত বর্ণনা সুসংরক্ষিত রহিয়াছে দুনিয়ার মুসলমানদের নিকট হাদীস বা সুন্নাতের মাধ্যমে। এই কুরআনের বিধান অনুযায়ী গঠিত লোকদের এক আদর্শ সমাজও তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। এই আদর্শ সমাজও দুনিয়ার মানুষের জন্য রাসূলের উপস্থাপিত আদর্শের বাস্তব প্রতিচ্ছবি হইয়া আছে পূর্ণ শুভ্রতা সহকারে। তাই হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুয়্যাত ও রিসালাত শাশ্বত ও চিরন্তন।

তাই কালেমার প্রথম অংশের সহিত শেষ অংশ মিলাইয়া যখন আমরা পড়ি— "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্", তখন আমরা যেমন বলি যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহাকেও প্রভু ও আইনদাতা বলিয়া মানি না, আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহাকেও প্রভুত্ব, নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধিকারী ও আইনদাতা স্বীকার করি না, সেই সঙ্গে আমরা একথাও ঘোষণা করি যে, আল্লাহ্র যে আইন-বিধান, জীবন যাপন প্রণালী এবং আল্লাহ্কে পাওয়ার যে পন্থা ও পদ্ধতি শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) প্রচার করিয়াছেন আমরা কেবল তাহাই মানি, তাহাই অনুসরণ করি; তাহা ছাড়া অন্য কিছু মানিতে আমরা মাত্রই প্রস্তুত নহি, কেননা তিনিই আমাদের চিরকালীন অনুসরণীয় নেতা। তাঁহার নীতির পরিপন্থী নীতি আমরা মানি না যেমন, তেমনি তাঁহার নেতৃত্বের পরিপন্থী নেতৃত্বও আমরা মানিতে প্রস্তুত নহি। হযরতের প্রচারিত পন্থা ও পদ্ধতির যাহা বিরোধী অথবা যাহা হযরতের উপস্থাপিত পন্থা নয় অথচ তাঁহারই পন্থা বলিয়া সমাজে চালাইয়া দেওয়া

হইতেছে, আমরা উহারও বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করি। এই পূর্ণ 'কালেমা' পাঠ করার পর যদি আমরা হযরতের উপস্থাপিত পন্থা ছাড়িয়া দেই এবং তাঁহার পরিবর্তে কোন আল্লাহ্দ্রোহী শক্তির বা বেঈমান লোকের দেওয়া আইন মানিয়া চলি, তাঁহার নীতি ও নেতৃত্বের পরিপন্থী কোন নীতি ও নেতৃত্ব অনুসরণ করি, তাহা হইলে আমাদের চেয়ে বড় মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক আর কেহই হইতে পারে না।

এই পূর্ণ 'কালেমা' পাঠ করার এবং ইহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পর শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) আমাদের একমাত্র 'আদর্শ নেতা'। দুনিয়ায় সুষ্ঠভাবে জীবন যাপনের ব্যাপারে অথবা জীবনের কোন ক্ষেত্রে— রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে হযরত মুহাম্মাদ (স) ছাড়া অন্য কাহাকেও আমরা 'আদর্শ নেতা' বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না এবং অন্য কাহারও নীতি অনুসারে আমরা কোন কাজই সম্পন্ন করিতে পারি না। এই 'কালেমা' পড়িয়া আমরা উচ্চৈঃস্বরে এই কথাই ঘোষণা করিয়া থাকি যে, দুনিয়ার নেতৃত্বের গদীতে সমাসীন হে বড় বড় মোহন্তগণ! তোমরা মিথ্যাবাদী, তোমরা অনধিকার চর্চাকারী, নেতৃত্ব করিবার কোন অধিকার তোমাদের নাই— যোগ্যতাও নাই। আমরা তোমাদিগকে 'নেতা' বলিয়া আদৌ স্বীকার করি না। আমাদের 'নেতা' হইতেছেন শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁহার অবর্তমানে তাঁহারই উপস্থাপিত বিধান অনুসারে যিনি আমাদের সংগঠিত ও পরিচালিত করিবেন এবং নেতৃত্ব দিবেন তাঁহারই নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য— তিনি। এতদ্ব্যতীত আর সকলেরই নেতৃত্ব মিথ্যা ও ধ্বংসাত্মক এবং তাহা নিস্তনাবুদ করিবার জন্যই আমরা আমরণ ক্ষমাহীন সংগ্রাম চালাইয়া যাইব।

এখানে কালেমা সংক্রান্ত একটি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত মুহাম্মাদ (স) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করিবে সে চিরদিন উহা হইতে প্রভুত 'কল্যাণ' লাভ করিতে থাকিবে এবং সকল প্রকার আযাব ও বিপদ-আপদ তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিবে। কিন্তু কালেমার হক আদায় করিতে কুণ্ঠিত হইলে ইহা হইতে কোন সুফলই সে লাভ করিতে পারিবে না। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন উহার হক আদায় করিতে কুণ্ঠিত হওয়ার অর্থ কি? হযরত মুহাম্মাদ (স) বলিলেন ঃ 'কালেমা পাঠ করিয়া প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ্র নাফরমানী করিলে, আল্লাহ্র প্রকাশ্য নাফরমানী করিতে দেখিয়াও উহার প্রতি হৃদয়মনে কোনরূপ ঘৃণা ও বিদ্বেষের উদ্রেক না হইলে এবং উহা বন্ধ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা না করিলেই কালেমার হক নষ্ট করা হয়।' (তারগীব ও তারহীম)

এই হাদীস হইতে পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পরা যায় যে, কালেমা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ্ ভিন্ন আর কেহ মা'বুদ নাই) পাঠ করার অর্থ শুধুমাত্র একজন

অলৌকিক মা'বুদকে স্বীকার করিয়া লওয়া এবং তাঁহাকে মুখে মুখে স্বীকার করিয়া তাঁহার যৎকিঞ্চিত ইবাদত (উপাসনা) করাই নয়; বরং প্রকৃতপক্ষে মানুষের বাস্তব কর্মজীবনের সহিত উহার নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। এই কালেমা পাঠ করিয়া একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হইলে অতপর মানুষের কর্মজীবনে সেই এক আল্লাহ্ তা'আলারই দেয়া বিধান পালন করিতে হইবে। তাঁহার আদেশ ও নিষেধ যথাযথভাবে মানিয়া চলিতে হইবে। তাঁহার দেওয়া আইন-বিধানকে এই দুনিয়ায় কায়েম করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা-সাধনা করিতে হইবে এবং উহার বিরুদ্ধে যে সব মানুষ নিজেদের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব তথা নিজেদের রচিত আইনের রাজত্ব কায়েম করিতে চাহে, তাহাদিগকে নির্মূল করিতে হইবে। কালেমা তাইয়্যেবা পাঠ করার ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্যে। এই কালেমা পাঠ করিয়া যদি তদানুযায়ী ইহার উদ্দেশ্য লাভ করিতে চেষ্টা না করা হয় তবে কালেমা পাঠের কোন সুফলই পাওয়া যাইবে না। তখন ইহা পাঠ করা বা না-করা এবং বিশ্বাস করা বা না-করার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনই পার্থক্য থাকে না; বরং সত্য বলিতে কি, এমতাবস্থায় 'কালেমা' পাঠ করিয়া ইহার অপমান না করাই বরং অনেক ভাল।

যে ব্যক্তি এই কালেমা পড়িয়াও মনে করে যে, আল্লাহ্‌র পুলিশ, আদালত কিংবা জেল কোথাও নাই, কাজেই তাঁহার আইন ভঙ্গ করা সহজ। কিন্তু আল্লাহ্‌দ্রোহী শক্তির রাজত্ব, তাহার পুলিশ, সৈন্য, আদালত এবং জেলখানা চারিদিকে দাঁড়াইয়া আছে, কাজেই তাহার বিরোধিতা করা সম্ভব নয়, সেই ব্যক্তির পক্ষে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলা একেবারে অর্থহীন। এমন ব্যক্তি অন্তর দিয়া কখনও আল্লাহ্‌কে একমাত্র প্রভু ও বাদশাহ এবং হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে একমাত্র আদর্শ নেতা বলিয়া বিশ্বাস করে না। কাজেই তাহার এই মুখে কালেমা পাঠ প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ্ সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا -

তোমার প্রভুর শপথ, তাহারা কখনই ঈমানদার হইতে পারে না, যদি তাহারা তাহাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদে (হে নবী) তোমাকেই একমাত্র বিচারক বলিয়া স্বীকার না করে এবং তুমি যে ফায়সালা করিবে তাহা অকুণ্ঠিত চিত্তে মানিয়া না লয়। (সূরা নিসা ঃ ৬৫)

'কালেমা তাইয়্যেবা'র এ ব্যাখ্যার পর প্রত্যেক কালেমা-বিশ্বাসী মুসলমানই নিজের সম্পর্কে ফায়সালা করিতে পারে যে, সে নিজে কি রকম মুসলমান— পুরা মুসলমান না আধা মুসলমান, খাঁটি মুসলমান, না মুনাফিক মুসলমান?

এখানে পরিষ্কার করিয়া জানিয়া লওয়া দরকার যে, যে ব্যক্তি জীবনের সমস্ত ব্যাপারে কেবল আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের হেদায়েত মানিয়া কাজ করে, প্রকৃতপক্ষে সে-ই খাঁটি ও আসল মুসলমান বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে— অন্য কেহ নয়।

এই কালেমার বিস্তারিত অর্থ আপনি যদি বুঝিয়া থাকেন এবং বুঝিয়া শুনিয়াই যদি এই কালেমার সাক্ষ্য আপনি দিয়া থাকেন, তাহা হইলে এখন আপনার চিন্তা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও অভিরুচি এবং আপনার সমগ্র জীবন এই কালেমারই নির্দেশ মত চলিবে। এখন আপনার মন-মগজে এমন কোন চিন্তা-কল্পনাই আসিতে পারে না, যাহা এই কালেমার বিরোধী। এখন আপনাকে চির-জীবনের জন্য এই ফায়সালা করিতে হইবে যে, যে কথা বা যে নীতি এ কালেমার বিরোধী, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা— একমাত্র এই কালেমাই সত্য। আপনার জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে এই কালেমাই হইবে আপনার পরিচালক ও নির্দেশদাতা। এই কালেমা পড়িয়া আপনি কাফিরদের ন্যায় স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী থাকিতে পারেন না। মন যাহা চাহে, তাহাই আপনি করিতে পারেন না। এখন আপনি এমন কোন সমাজ, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও প্রশাসন ব্যবস্থাও মানিয়া লইতে পারেন না, যাহা মহান সৃষ্টিকর্তার প্রভুত্ব সার্বভৌমত্ব ও আইন-বিধানের উপর ভিত্তিশীল এবং উহার অনুসারী নয়, যাহা মানুষকে আল্লাহ্‌র অনুগত না বানাইয়া মানুষের গোলামী করিতে বাধ্য করে। এমন কোন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাও আপনি বরদাশত করিতে পারেন না, যাহা তরুণ বংশধরদিগকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ভাবধারায় সমৃদ্ধ করে না; বরং নাস্তিক নীতিভ্রষ্ট ও চরিত্রহীন বানায়। এখন আপনি কোন ফাসিক বা কাফির ব্যক্তিকে আপনার 'নেতা' রূপে মানিয়া লইতে পারেন না; আপনি ইসলাম বিরোধী আদর্শ ও নিয়মে গঠিত কোন দল বা সমিতি ও সংস্থার সদস্য হইতে পারেন না। এমন কোন দলে আপনি যোগ দিতে পারেন না, যাহার আন্দোলন ও চেষ্টা-সংগ্রামের মূল লক্ষ্য দুনিয়ায় কোন অনৈসলামিক বিধান প্রতিষ্ঠিত করা বা নিছক বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধার করা। এখন আপনি নিজেকে আপনার নিজের কিংবা অন্য কাহাকেও তাহার ধন-সম্পত্তির নিরংকুশ মালিক বলিয়া মানিয়া লইতে পারেন না। রুজী-রোজগার, অর্থোপার্জন, অর্থ ব্যয় ও ব্যবহারে এমন কোন পন্থা আপনি অবলম্বন করিতে পারেন না, যাহা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। এক কথায়, এই কালেমা অনুসরণ করিয়াই আপনাকে সমগ্র জীবন যাপন করিতে হইবে। ইহা যাহাই করিতে বলিবে, তাহাই আপনাকে করিতে হইবে— তাহাতে যদি আপনার লাখ টাকার ক্ষতি হয় কিংবা আপনার জীবনকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন করিতে হয়, তবুও। আর এই কালেমা আপনাকে যে কাজ করিতে নিষেধ করিবে তাহা আপনি করিতে পারিবেন না— তাহাতে যদি আপনার অনেক কিছু হারাইতেও হয়, এমনকি আপনাকে মৃত্যুও বরণ করিতে হয়, তবুও সেই কাজ আপনি করিতে পারিবেন না। মোটকথা, এই

কালেমার রজ্জু দ্বারা আপনার সমগ্র জীবনকেই বাঁধিয়া লইতে হইবে। হযরত নবী করীম (স) এই কথাটি বড় সুন্দর উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ

مَثَلُ الْمُوْمِنِ وَمَثَلُ الْاِيْمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِىْ اٰخِيَتِه يَجُوْلُ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى اٰخِيَتِه -

মুমিন ব্যক্তি এরং তাহার ঈমানের উদাহরণ— যেমন রশি দ্বারা খুঁটির সহিত বাঁধা একটি ঘোড়া। ঘোড়াটি ঘুরিয়া-ফিরিয়া সেই খুঁটির দিকেই যাইতে বাধ্য হয়। মুমিন ব্যক্তির গলদেশও ঈমানের রশি দিয়া বাঁধা, সে তাহার বাহিরে যাইতে পারে না।

এইভাবেই যদি আপনি কালেমা তাইয়্যেবা পড়িতে পারেন, কালেমা পড়িয়া যদি আপনি নিজেকে এইভাবে গঠন করিতে পারেন তবেই আপনি খাঁটি মুসলমান হইতে পারিবেন, তবেই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে এবং পরকালে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করিয়া জাহান্নামের আগুন হইতে বাঁচিতে ও বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, এইরূপ বিপ্লবী ভাবধারা সম্পন্ন হইয়া আপনি একাকী কোথাও সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপন করিতে পারিবেন না; সেজন্য অনুরূপ ভাবধারাসম্পন্ন এমন এক সমাজ সমষ্টিও আপনাকে গঠন করিতে সচেষ্ট হইতে হইবে, যেখানে পুরাপুরিভাবে এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান ও আনুগত্য রক্ষা করিয়া পূর্ণাঙ্গভাবে জীবন যাপন করা সম্ভবপর হইবে। কেননা এই কালেমাকে ব্যক্তি জীবনের সংকীর্ণ পরিসরে পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করা যায় না, সেজন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজের একান্ত প্রয়োজন।

শির্‌ক ও বর্তমান মুসলমান

কালেমা তাইয়্যেবার এই বিস্তারিত ব্যাখ্যা হইতে তওহীদের তত্ত্বকথা আপনারা জানিতে পারিয়াছেন। এই তওহীদের ঠিক বিপরীত হইতেছে শির্‌ক। তওহীদকে পূর্ণরূপে পাইতে হইলে আমাদের যেমন শির্‌ক হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, তেমনি তওহীদের অর্থ ও মর্মকে আরও ব্যাপক ও আরও খোলাখুলিভাবে বুঝিতে হইলে শির্‌কের পরিচয়টিও আমাদের লাভ করা দরকার।

সাধারণত মুসলমানগণ মনে করেন যে, দুনিয়ার নবীগণ যে সব জাতির নিকট তওহীদ ও 'কালেমা তাইয়্যেবা'র দাওয়াত দিয়াছেন তাহারা সকলেই নাস্তিক ছিল, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব তাহারা স্বীকার করিত না, কিংবা আল্লাহ্‌কে তাহারা মানিত না। তাহারা কেবল দেবদেবী বা মূর্তিরই পূজা করিত, এই জন্য তাহারা মুশরিক ছিল। কিন্তু আমরা আল্লাহ্‌কে মানি, তাঁহার রাসূলকে মানি, কাজেই আমরা কোন প্রকারেই মুশরিক হইতে পারি না। আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাহদিগকে যদি

আমরা বিপদের সময় ডাকি কিংবা তাঁহাদের সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাহাদের কবরস্থানে মেলা বসাই, মানত মানি আর সিজদা করি অথবা আমাদের আলেম, পীর ও নেতৃবৃন্দ কিংবা আমাদের প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার দাসত্ব করি, তবে আমাদের তওহীদ-বিশ্বাস এবং আমাদের মুসলমানিত্ব এতটুকুও নষ্ট হইবে না— শির্‌ক আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিবার পথ পাইবে না। আমরা চিরকাল তওহীদবাদীই থাকিয়া যাইব।

কিন্তু কুরআন পাঠ করিলেই পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় যে, মুসলমানদের এই ধারণা একেবারে ভুল— ইহা কুরআনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইসলাম কি জিনিস তাহা না জানার ফলেই আমাদের মধ্যে এই প্রকার ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। বস্তুত কুরআন পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, দুনিয়ার প্রত্যেক কাফির বা মুশরিক জাতিই আল্লাহ্‌কে মানিত। তাহারা বিশ্বাস করিত ঃ আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, বায়ু, পানি প্রভৃতি সব জিনিসেরই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ তা'আলা। জীবনদাতা, রিযিকদাতা, মৃত্যুদাতা ও বিশ্ব প্রকৃতির পরিচালক হিসাবেও তাহারা আল্লাহ্‌কে মানিত। কিন্তু সেই সঙ্গে তাহারা আল্লাহ্‌ ছাড়া এইসব ব্যাপারে অন্যান্য শক্তির দখল বা অংশীদারিত্ব আছে বলিয়াও বিশ্বাস করিত আর ইহাই হইল শির্‌ক। এই কারণে আল্লাহ্‌ আছেন একথা তাহারা বিশ্বাস করা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদিগকে মুশরিক নামে অভিহিত করিয়াছেন। এখন ভাবিবার বিষয় এই যে, এই সব ধারণা যদি মুসলমানদের মধ্যেও পাওয়া যায়, মুসলমানও যদি আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যান্য শক্তিতে আল্লাহ্‌র গুণ ও শক্তি আছে বলিয়া মনে করে, এক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী হইয়াও আল্লাহ্‌র আইন-বিধান বাদ দিয়া মানুষের রচিত আইন-বিধান মানিয়া চলিতে মনে-প্রাণে যদি রাজী হয়, তাহা হইলে মুসলমানও কি মুশরিক হইয়া যাইবে না? মুশরিক, আহলি কিতাব, মুনাফিক প্রভৃতির যেসব কাজ শির্‌ক বলিয়া অভিহিত হইতে পারে এবং যে জন্য তাহারা মুশরিক নামে পরিচিত হইল সেই বিশ্বাস বা সেই কাজ যদি মুসলমানগণও নিজেদের মধ্যে স্থান দেয়, তবে তাহারা মুশরিক হইবে না কেন? ইহার কি সত্যই কোন যুক্তি আছে? বাস্তবিকই একজন মানুষের পক্ষে যে কাজ পাপ, অন্য একজনের পক্ষে তাহা পূণ্য হওয়ার বা পাপ না-হওয়ার কোন কারণই থাকিতে পারে না। আল্লাহ্‌র নিকট এমন পক্ষপাতিত্ব নাই— থাকা অসম্ভব। সমস্ত মানুষ তাঁহারই সৃষ্টি, সমানভাবে তাঁহারই বান্দাহ্‌; যে লোক যে কাজ করিবে— সে কাজের ফল সে-ই ভোগ করিবে। বিষ খাইলে অন্য লোক মরিয়া যাইবে, কিন্তু মুসলমান মরিবে না; আগুনে পড়িলে অন্য লোক জ্বলিবে, কিন্তু মুসলমান জ্বলিবে না— এমন কোন কথাই হইতে পারে না; বরং একটু চিন্তা করিলে আপনারা একথাও মানিতে বাধ্য হইবেন যে, যে-কাজ বা বিশ্বাস দুনিয়ার অন্যান্য জাতির মধ্যে থাকিলে তাহারা মুশরিক হইয়া যায়, সেই কাজ এবং সেই বিশ্বাস যদি তওহীদবাদী

মুসলমানদের মধ্যেও পাওয়া যায়, তবে তাহারা আরও বেশী কঠিন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হইবে।

এখন আপনি যদি কুরআনের মানদণ্ডে বর্তমান মুসলমানদের অবস্থা যাচাই করেন, তবে একথা মানিতে বাধ্য হইবেন যে, অসংখ্য শির্কী বিশ্বাস ও কাজ এখনকার মুসলমানদের মধ্যে বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। বহু মুসলমান বিশ্বাস করিয়া থাকে যে, তাহাদের পীর-দরবেশ অদৃশ্য জগতের খবর রাখেন; তাহাদের নেক নজরে মানুষের উপকার এবং তাঁহাদের বদ-দো'আয় মানুষের সমূহ ক্ষতি হইতে পারে। তাহাদের দো'আয় নিঃসন্তান সন্তান পাইতে ও বেকার চাকুরী পাইতে পারে। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি বিপদ হইতে মুক্তি পাইতে পারে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ - وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

হে নবী! আল্লাহ্ যদি তোমার কোন অপকার বা ক্ষতি করেন, তবে তিনি ছাড়া তাহা কেহই দূর করিতে পারে না। তিনি যদি তোমার কোন উপকার করেন, তবে (তাহাও তিনিই করিতে সক্ষম) তিনি সর্বশক্তিমান।
(আন'আম ঃ ১৭)

قُلْ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا - قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا -

হে নবী! আপনি বলিয়া দিন যে, তোমাদের লাভ বা লোকসানের ব্যাপারে আমার কোন হাত নাই। আপনি আরও বলিয়া দিন যে, আমাকে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহ রক্ষা করিতে পারে না— তিনি ছাড়া অন্য কাহারো নিকটও আমি কখনো আশ্রয় পাইব না।[১]

আয়াত দুইটি হইতে পরিষ্কার প্রমাণ হইতেছে যে, মানুষের উপকার-অপকার বা ভাল-মন্দ কোন কিছু করিবার ক্ষমতা কোন পীরের নাই; কোন

১. কেহ কেহ মনে করেন, এই আয়াতটি মনসুখ হইয়া গিয়াছে; কাজেই উহাকে কোন দলীল হিসাবে পেশ করা যায় না। কিন্তু এই কথা ঠিক নয়, চূড়ান্ত নয়। অবশ্য একথা সত্য যে, মনসুখ হওয়ার কথাও কোন কোন সাহাবী হইতে বর্ণিত হইয়াছে। আসল ব্যাপার হইল, এই আয়াতে বলা কথাই হইল রাসূলে করীমের আসল অবস্থা। তিনি সত্যই কিছু জানিতেন না, জানিতেন শুধু ততটুকু, যতটুকু আল্লাহ্ তাঁহাকে ওহীর মাধ্যমে জানাইতেন। ইমাম কুরতুবী ও মাহমুদ আলূসী প্রমুখ বড় বড় মুফাস্সির বলিয়াছেনঃ এ আয়াতটি মনসুখ হয় নাই।

উকিল-মুখতার, রাজা-বাদশা কিংবা কোন নেতা বা কোন বিচারকের নাই। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং হযরত মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক ঘোষণা করাইয়াছেন যে, প্রকৃত ক্ষমতা তাঁহারও নাই। প্রকৃত ক্ষমতা এবং অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই রহিয়াছে। কাজেই বিপদে-আপদে ও দুঃখ-মুসিবতে কেবল তাঁহাকেই ডাকিতে হইবে। কেবল তাঁহারই নিকট আশ্রয় চাহিতে হইবে। অন্য কাহারও নিকট তাহা চাহিলে তাহা কালেমারই বিপরীত হইবে।

মুসলমানদের মধ্যে আর একটি মারাত্মক ধারণা পাওয়া যায়, তাহা হইতেছে শাফা'আতের বিকৃত ধারণা। তাহারা মনে করে, বড় বড় পীর-দরবেশ, ওলী-আল্লাহ্ বা আলেম-মওলানা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করিয়া তাহাদিগকে জাহান্নাম হইতে বাঁচাইয়া বেহেশতে পৌঁছাইয়া দিবে। মূলত এই ধারণাও একেবারে ভিত্তিহীন— কুরআনী শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا - وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ -

কিয়ামতের দিন কেহ কাহারও কোন উপকারে আসিবে না। এই দিন সমস্ত বাদশাহী এবং কর্তৃত্বের অধিকারী হইবেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা।
(ইনফিতার ঃ ১৯)

পীর সাহেবান তো দূরের কথা স্বয়ং বিশ্বনবী, মানবশ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করিতে বলিয়াছেন ঃ

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ -

বল হে নবী! আমি কোন নূতন নবী নহি। আমি নিজেই জানি না যে, (কিয়ামতের দিন) আমার এবং তোমাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইবে।

এই শাফা'আত[১] বা সুপারিশের ভুল ধারণা প্রচার করিয়া এক শ্রেণীর স্বার্থপর পীর মূর্খ জনগণকে নিজেদের অন্ধ গোলাম বানাইয়া লইয়াছে। তাহারা লোকদিগকে বুঝাইয়াছে যে, পীরকে খুশী করিতে পারিলে আল্লাহ্ও খুশী হইবেন। কিন্তু কুরআনের এই আয়াত এবং কালেমা তাইয়্যেবার পূর্বোল্লিখিত অর্থ জানিয়া কোন মুসলমানই আর আর এই ভুল ধারণা মনের মধ্যে স্থান দিতে পারে না।

১. শাফা'আত সম্পর্কিত ধারণা দুই প্রকার। প্রথম প্রকার, আল্লাহ্র নিকট শুধু দো'আ করা। আর দ্বিতীয় প্রকার, আল্লাহ্র উপর জোর করিয়া কোন কথা মানাইয়া লওয়া। শুধু দো'আ করা এবং সেই দো'আ মঞ্জুর করা বা না-করার ইখতিয়ার আল্লাহ্ তা'আলার— শাফা'আতের এই ধারণাকে ইসলাম সমর্থন করে। অন্যটি পরিষ্কার শিরক।

বস্তুত এই ধারণা সাধারণ মুসলমানকে ইসলামী কর্ম-কাণ্ড ও ভাবধারা হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। তাহারা উক্ত ধারণাকে সত্য ধরিয়া কেবল পীরের হাতে হাত দিয়া, পীরকে ভেট-বেগার, হাদিয়া-তোহফা ও কদমবুসি দিয়া খুশি করিতেই ব্যস্ত হইয়াছে প্রাণপণে। ফলে তওহীদের ভাবধারা বিদায় লইয়া শির্‌কের অন্ধকার আসিয়া জীবনকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এই পর্যায়ে বর্তমানে অতিশয় মারাত্মক হইয়া দেখা দিয়াছে কবর-পূজার প্রবণতা। যে কোন ব্যক্তিগত বা জাতীয় কাজের সূচনা কালে কোন বিশেষ পীর বা 'শহীদ' নামে কথিত ব্যক্তির কবরে হাযিরা দেওয়া হয় সর্বপ্রথম। মনে করা হয়, কবরে শায়িত ব্যক্তি তাহাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে কিংবা তাহার বিপদ দূর করিয়া দিবে। এই সময় ইহারা আল্লাহ্‌কে সম্পূর্ণ ভুলিয়া যায় এবং কবরে শায়িত ব্যক্তিকে ভাল-মন্দের মালিক বানাইয়া লয়। ইহা যে সুস্পষ্টভাবে শির্‌ক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এতদ্ব্যতীত আমাদের মুসলিম সমাজ বর্তমান ইসলাম-বিরোধী নেতৃত্বকে (Leadership) অন্ধভাবে মানিয়া ও অনুসরণ করিয়া আর এক প্রকারের শির্‌কের সঙ্গে জড়াইয়া পড়িয়াছে। কালেমা তাইয়্যেবা বুঝিয়া পড়িলে ও মন দিয়া বিশ্বাস করিলে বর্তমানের এই নেতৃত্বকে এক মুহূর্তের তরেও বরদাশত করা যায় না। কারণ বর্তমান সময় মুসলিম জাতি বা রাষ্ট্রের উপর যাহারা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব করিতেছে, তাহারা নিজেরাই নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের মূলমন্ত্র— কালেমাকে মানিয়া চলে না; তাহাদের নিজেদের জীবন নানাবিধ নাফরমানীর বোঝায় একেবারে ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। পরন্তু তাহারা মুসলমান জনগণকে আল্লাহ্‌র আইন দ্বারা শাসন করে না, ইসলামের সামাজিক ও সাংগঠনিক আদর্শে তাহাদিগকে সংগঠিত করে না; তাহাদের সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং তাহাদের নিজস্ব কর্মপন্থা আল্লাহ্‌র বিধানের সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন নয়।

পরন্তু তাহারা যখন মুসলমনদের শাসন ক্ষমতা লাভ করে তখন তাহারা আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে না, করে প্রচলিত মানব রচিত আইন অনুযায়ী কিংবা নিজেদের মর্জীমত। তাহারা মানুষকে আল্লাহ্‌র দাস না বানাইয়া নিজেদের নিকৃষ্ট দাসে পরিণত করে; আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করিতে তাহারা প্রবল শক্তিতে বাধা দেয়। আল্লাহ্‌র বিধান প্রতিষ্ঠিত করার সব চেষ্টা ও সংগ্রামকে তাহারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু তবুও মুসলমানগণ সংগঠন ও শাসন-প্রণালী নীরবে সহ্য করিয়া ইসলাম বিরোধী নেতৃত্বকে অন্ধভাবে মানিয়া চলিতেছে। বর্তমান যুগে ইহা এক প্রকার মারাত্মক শির্‌ক। এই শির্‌ক মুসলমানদের জীবনকে ইসলামের সীমার বাহিরে লইয়া যাইতে খুব বেশী সাহায্য করিতেছে। কিন্তু কালেমা তাইয়্যেবা যাহারা মানিবে ও বিশ্বাস করিবে, তাহাদের প্রতি এই কালেমার আদেশ এই যে, তাহারা যেন এই ধরনের কোন নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব কোনক্রমেই স্বীকার না করে। অন্যায় নীতি ও পাপ কাজের আদেশ— পীর বুযর্গ, রাজা-বাদশাহ, নেতা ও মাতব্বর, আলেম-মওলানা— যাহারই হউক না কেন, তাহা কিছুতেই মানিয়া লওয়া যাইবে না। এমন কি সব চেয়ে বেশী মান্য করার আদেশ হইয়াছে যে পিতা-মাতাকে, তওহীদ স্বীকার করার পর সেই পিতা-মাতারও কোন অন্যায় আদেশ মানিতে হইবে না; আল্লাহ্ তা'আলা তাহা পরিষ্কার ভাষায় নিষেধ করিয়া দিয়াছেন; এক্ষেত্রে নেতা, পীর বা মাতব্বরদের তো কোন কথাই উঠিতে পারে না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا –

তোমার পিতা-মাতা যদি আমার (আল্লাহ্‌র) সঙ্গে কোন শির্‌ক করিতে তোমাকে বাধ্য করে— যে সম্পর্কে তোমার বিন্দুমাত্র জ্ঞান নাই— তবে তাহাদের আদেশ মোটেই পালন করিও না। (সূরা লুকমা ঃ ১৫)

শেষ কথা

তওহীদের বিস্তারিত ব্যাখ্যার পর সাধারণভাবে সমাজে প্রচলিত শির্‌কের পরিচয়ও আমরা পাঠকদের খেদমতে পেশ করিলাম। আশা করি, এই দুইটি বুনিয়াদী বিষয় পাঠকগণ পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন।

আমরা মুসলমান; ইসলাম আমাদের ধর্ম— আমাদের জীবন-ব্যবস্থা। সেই ইসলামের বুনিয়াদ স্থাপিত হইয়াছে তওহীদের উপর। তওহীদ না থাকিলে ইসলামের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই তওহীদের একমাত্র শত্রু হইতেছে শির্‌ক। কাজেই তওহীদকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে আমাদের বিশেষ সতর্কতার সহিত শির্‌ক হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। হাজার মুসলমানী— হাজার ইবাদাত-বন্দেগীর মধ্যে শিরকের একটি বিন্দুও যদি কোন রকমে প্রবেশ করে, তাহা হইলে বিশ্বাস করুন, আপনার নেক আমলের সব পরিশ্রম সম্পূর্ণরূপে বৃথা যাইবে। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হইয়াছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ – وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا –

আল্লাহ্ কখনও শির্‌ক ক্ষমা করিবেন না, অন্য গুনাহ ইচ্ছা করিলে তিনি ক্ষমা করিবেন। সুতরাং যে লোক আল্লাহ্‌র সহিত শির্‌ক করে সে অযথাই এক মহাপাপের বোঝা নিজের উপর টানিয়া লয়। (সূরা নিসাঃ ৪৮)

আর শির্‌ক এমন মহাপাপ যা মানুষের সমস্ত নেক আমল নষ্ট করিয়া দেয়। বলা হইয়াছে ঃ

وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

শির্ক করিলে তাহাদের যাবতীয় ইবাদাত-বন্দেগীর কাজ সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়া যাইবে। (আন'আম ঃ ৮৮)

এই শির্ক কয়েকভাবে মানুষের মধ্যে প্রসার লাভ করিতে পারে। আল্লাহ্‌র মূল সত্তা কয়েক অংশে বিভক্ত— এইরূপ আকীদা রাখিলে শির্ক হইবে। আল্লাহ্‌র বিশেষ কোন গুণ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও মধ্যে আছে— এইরূপ বিশ্বাস থাকিলেও শির্ক হইবে। মানুষের সৃষ্টিকর্তা কেবলমাত্র আল্লাহ্, রক্ষাকারী ও রিযিকদাতাও তিনি ছাড়া আর কেহই নহে। কাজেই সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও রিযিকদাতা হিসাবে অন্য কাহাকেও বিন্দুমাত্র মানিলেও শির্ক হইবে। অনুরূপভাবে প্রভুত্ব সার্বভৌমত্ব ও আইন রচনায় অন্য কাহারও একবিন্দু অধিকার আছে বলিয়া বিশ্বাস করিলে এবং সেই বিশ্বাস লইয়া অপ্রতিবাদী হইয়া সেই আইন মানিয়া চলিলেও শির্ক হইবে। আল্লাহ্‌র আইনকে বাদ দিয়া অন্যভাবে অন্য কাহারও রচিত আইন মনের সন্তুষ্টি সহকারে পালন করিলেও সুস্পষ্ট শির্ক হইবে।[১]

বস্তুত এই কালেমা একটি পূর্ণাঙ্গ তওহীদী আকীদা দুনিয়ার মানুষের সামনে পেশ করিয়াছে। তাহাতে আল্লাহ্ তা'আলাকে সর্বতোভাবে এক ও লা-শরীক মানিয়া লইতে বলা হইয়াছে। তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা, এ ব্যাপারে অন্য কেহ তাঁহার শরীক নাই। একমাত্র তিনিই মানুষের ভয় করার ও ইবাদত পাওয়ার যোগ্য, ইহাতে অন্য কেহই তাঁহার শরীক নাই। তিনিই মানুষের জন্য একমাত্র আইন ও বিধানদাতা— এক্ষেত্রে অন্য কেহই তাঁহার শরীক নাই।

এই তওহীদী আকীদার ভিত্তিতেই আল্লাহ্ তা'আলা রচনা করিয়াছেন তাঁহার মনোনীত দ্বীন-ইসলাম— সমস্ত মানুষের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসাবে। কেবল তাঁহার দেওয়া এই জীবন-বিধানকেই গ্রহণ করা যাইবে— গ্রহণ করিতে

১. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও দাসত্ব স্বীকার করিলে বা বন্দেগী করিলেই শির্ক হয়, অন্য কাহারও দেওয়া আইন মানিলে শির্ক হয় না, এই কথা বিশ্বাস করাও শির্ক। আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَااٰبَاؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ -
শির্ককারীরা বলে, আল্লাহ্ চাহিলে আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষ তাঁহাকে ছাড়া অন্য কাহারও দাসত্ব বা ইবাদত করিতাম না। আর তাঁহার হালাল-হারাম বাদ দিয়া আমরা নিজেরাই কোন কিছু হারাম করিতাম না। (সূরা নহল ঃ ৩৫)
এই আয়াত হইতে সুস্পষ্টভাবে জানা গেল যে, আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া অন্য কাহারও দাসত্ব গ্রহণ ও বন্দেগী করা যেমন শির্ক, আল্লাহ্‌র হালাল-হারামের আইন বাদ দিয়া নিজেরাই হালাল-হারামের আইন রচনা করিয়া লওয়াও ঠিক সেই রকমেরই শির্ক।

হইবে। তিনি ইহাতে একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনীতি ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা দিয়াছেন; একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজব্যবস্থা ও অর্থনীতি দিয়াছেন। সেই সঙ্গে বিচার কার্যের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ আইনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এইগুলিকে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করাই তওহীদে বিশ্বাসী লোকদের কর্তব্য। আর এই কর্তব্য পালনের সচেষ্ট হইলেই মুসলিম হিসাবে দায়িত্ব পালিত হইবে। অন্যথায় নামের ও বংশের পরিচয়ে 'মুসলিম' হইলেও প্রকৃত মুসলিম হওয়া সম্ভব হইবে না।

তাই সব ইবাদত-বন্দেগীর পূর্বে আকীদা-বিশ্বাস সঠিকভাবে পুনর্গঠন করা একান্ত আবশ্যক। প্রথমে মন হইতে সব রকমের শির্কী ধ্যান-ধারণা, মত-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা বিদূরিত করিয়া মনকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন করিয়া লইতে হইবে এবং তারপর তওহীদকে মনের মধ্যে সংস্থাপন করিতে হইবে। ভাল ফসল পাইতে হইলে যেমন প্রথমে লাঙ্গল চালাইয়া সমস্ত বন-জঙ্গল দূর করিতে হয় এবং জমিকে সম্পূর্ণরূপে জঞ্জাল ও আবর্জনামুক্ত করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিতে হয়, মানুষের মস্তিষ্ক ও মনের ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমাদের তওহীদ-বিশ্বাস আমাদের মন-মগজ ও জীবনকে— জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগকে ইসলামের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে পারিবে। সেইজন্য প্রথমেই বলিতে হয় 'লা-ইলাহা'— কেহই আমার ইলাহ্ নাই; আমি কাহাকেও 'ইলাহ্' মানি না। তারপর মন হইতে সমস্ত 'ইলাহ্'-এর অস্তিত্ব, নাম নিশানা, ভয়-ভাবনা, ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং নতি ও আনুগত্য স্বীকারের সকল ভাবধারা চিরতরে দূর করিয়া বলিতে হয় ঃ 'ইল্লাল্লাহ'— আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহই মা'বুদ নাই; আল্লাহ্‌র প্রতিদ্বন্দ্বী বা সমতুল্য কেহ নাই। কিন্তু আমরা সাধারণ মুসলমানরা দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টা এই কালেমা মুখে মুখে পড়িতেছি। আমাদের মধ্যে অনেকেই আবার এই কালেমা দ্বারা ফাস-আনফাস ও নফী-ইসবাতের 'যিকির' করিয়া কলব ঘষিয়া সাফ করিতে ব্যতিব্যস্ত। আর একদল আবার এই কালেমা লইয়া পথে-ঘাটে বাহির হইয়া যাইতেছে, অলিতে-গলিতে ও বাড়িতে-বাড়িতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আর যাহাকে পাইতেছে, তাহাকেই ধরিয়া বলিতেছে ঃ কালেমা পড়। কালেমার অর্থও তাহারা কিছু না কিছু শুনাইয়া দেয় না এমন নহে। এই সকল শ্রেণীর লোকেরা মনে করিয়া থাকে— মনে মনে কিছুটা অহমিকাও বোধ করিয়া থাকে— যে, তাহারা ইসলামের মূলমন্ত্র এই কালেমা তাইয়্যেবার প্রচারের 'হক' পূর্ণরূপে আদায় করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার ঘষায় 'কল্‌বের' সব ময়লা দূর হইয়া আয়নার মত সাফ হইয়া গিয়াছে— ইহার দ্বারা সাত তবক আসমান ও জমিন পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। অন্যদিকে মনে করা হইতেছে যে, শুধু কালেমা পড়িয়াই আমাদের মুসলমানী কায়েম হইয়া গিয়াছে। বাস্তব কর্মজীবনে,

বিশেষত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইসলাম পালনের কোন প্রয়োজন নাই বলিলেই চলে।

বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, আমাদের এইসব ধারণা ও খেয়াল, কালেমা প্রচারের এই পন্থা এবং কালেমা তাইয়্যেবার এই ব্যবহার আগাগোড়া একেবারেই ভুল। ইহার কোনটিই ইসলামী নয়। কুরআন-হাদীস, ইসলামের ইতিহাস, রাসূলুল্লাহ্‌র কর্মপন্থা এবং ইসলামী আন্দোলনের কর্ম-পদ্ধতি যাহারা জানেন, তাহাদের নিকট আমার এই কথা কিছুমাত্র নূতন ঠেকিবে না। কেননা, প্রকৃতপক্ষে কালেমা তাইয়্যেবা প্রথমত একটি বিপ্লবী আকীদা ও বিশ্বাস, চিন্তা ও মতবাদ মাত্র। দ্বিতীয় স্তরে উহা বাস্তব কর্ম জীবনের আদর্শ ও চরিত্র গঠনের মৌলিক মানদণ্ড। তৃতীয় স্তরে ইহা আন্দোলনের মূল দাওয়াত এবং জন-সংগঠন ও সমাজ-সংশোধনের হাতিয়ার। আর চতুর্থ স্তরে ইহা একটি বিপ্লব, একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজের ভিত্তি, একটি স্বাধীন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও সরকারী নীতি নির্ধারণের মূলনীতি, ভিন্নতর জাতি ও রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের স্থায়ী মাপকাঠি। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনাদর্শ ও কর্মধারা হইতে এই কথার সত্যতা অনস্বীকার্যরূপে প্রমাণিত হয়। তাই কালেমার এই মর্যাদা ও ধারণাকে যথার্থরূপে বজায় রাখা ও এইরূপ ক্রমিক ধারার ভিত্তিতে ইহাকে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ করিয়া দেওয়া এবং সেই জন্য চেষ্টা করাই কালেমা বিশ্বাসী লোকদের কর্তব্য। মোটামুটি এই কালেমার প্রচার এবং ব্যবহার ঠিক তেমনিভাবে করিতে হইবে, যেমন করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)। এই প্রসঙ্গে আর একটি দরকারী কথা না বলিলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ব্যক্তি হিসাবে একজন মুসলমান হওয়ার জন্য যেমন কালেমা তাইয়্যেবা পাঠ করা দরকার, একটি জনসমষ্টির মুসলমান হওয়ার জন্যও ঠিক তেমনিভাবে কালেমা পড়িতে হয়। আমরা দুনিয়ার মুসলমানরা ব্যক্তিগতভাবে সকলেই কালেমা পড়িয়াছি; জাতি হিসাবেও আমাদিগকে কালেমা পড়িতে হইবে ইহাকে রাষ্ট্রীয় আদর্শরূপে ঘোষণা করার মাধ্যমে। আমাদের সংবিধান ও যাবতীয় আইন-কানুনও এই কালেমা অনুযায়ী রচনা করিতে এবং সেই অনুযায়ী কার্যত রাষ্ট্রকে চালাইতে হইবে। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আমরা অমুক দেশের জনগণ এক আল্লাহ্‌কে সারে জাহানের মালিক ও প্রভু বলিয়া স্বীকার করি এবং তাঁহার আমানত এই রাষ্ট্রকে তাঁহারই বিধানমত আমরা চালাইব। আবার কোন কোন দেশের সংবিধানে লিখিত হইয়াছেঃ "সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি।" সেই সাথে ব্যাখ্যা স্বরূপ লিখিত হইয়াছে ঃ এই নীতিসমূহ দেশ পরিচালনার মূল সূত্র হইবে, আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবে। ...... অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যা দানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কাজের ভিত্তি হইবে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কেহ শুধু কালেমা পড়িয়াই যেমন

'মুসলমান' হইতে পারে না, জাতিগতভাবেও কোন দেশবাসী শুধু এই প্রস্তাবনা বা লিখিত দলীল দ্বারাই পূর্ণ মুসলমান হইতে পারে না এবং তাহাদের রাষ্ট্রও খালেস ইসলামী হুকুমত হইতে পারে না। এই কারণে সংবিধানের ওইসব ঘোষণা সম্পূর্ণ অর্থহীন হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য একান্ত প্রয়োজন কার্যত এই ঘোষণাকে মান্য করা ও তদনুসারে সমস্ত কাজ আঞ্জাম দেওয়া আর সেই লক্ষ্যে এমন লোকদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা, যাহারা কালেমার প্রতি সচেতন ঈমানদার, বাস্তবে উহা পালন করিয়া চলে এবং সেই অনুযায়ী রাষ্ট্র চালাইবার যোগ্যতা রাখে। তাই আজ একদিকে মুসলমানদের ব্যক্তিগত জীবনকে যেমন কালেমা অনুযায়ী পূর্ণ ইসলামী বানাইতে চেষ্টা করা কর্তব্য, ঠিক তেমনি তাহাদের জাতীয় জীবন ও রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি বিভাগকে বাস্তবভাবে পূর্ণ ইসলামী আদর্শে ঢালিয়া গঠন করাও একান্ত আবশ্যক। দুনিয়ার মুসলমানদের আজ ইহাই একমাত্র কাজ। এই কাজে যিনি বেশী চেষ্টা করিবেন, তাঁহার কালেমা পড়া দুনিয়া ও আখিরাতে ততই সার্থক ও ফলদায়ক হইবে, সন্দেহ নাই।

অতএব, আসুন, তওহীদের এই বিপ্লবী কালেমা লইয়া আবার আমরা পৃথিবীর বুকে মাথা জাগাইয়া উঠি। নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে এই কালেমার আদর্শে ঢালিয়া গঠন করি, সমাজ হইতে যাবতীয় শিরক, বিদয়াত এবং সর্ব প্রকার পাপপ্রথা ও অব্যবস্থাকে সকলে মিলিয়া চূর্ণ করিয়া দেই, বিশ্বনবীর প্রচারিত 'তওহীদী দ্বীন'কে প্রথমে নিজ নিজ দেশে এবং তারপর সমগ্র দুনিয়ার বুকে আবার জয়যুক্ত করিয়া তুলি; সেই অনুযায়ী সংবিধান, আইন-কানুন, শিক্ষা ব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও অর্থ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলি। এজন্য এক সংঘবদ্ধ গণমুখী সংগ্রাম চালাইতে হইবে। প্রত্যেকটি মানুষকে এই কালেমার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে; গঠন করিতে হইবে প্রত্যেকটি পরিবার, সমাজ ও জনসমষ্টিকে। এই সংগ্রাম অব্যাহতভাবে চালাইয়া যাওয়াই মুসলমানদের সারা জীবনের কাজ। আল্লাহ্‌র নিকট হইতে ইহাই তাহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব। এই দায়িত্বের কথা সর্বক্ষণ সর্বাবস্থায়ই মনের মধ্যে জাগরুক রাখিতে হইবে— মুহূর্তের তরেও ইহা ভুলিয়া যাওয়া চলিবে না। অন্যথায় কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট লজ্জিত ও দণ্ডপ্রাপ্ত হইতে হইবে। এ পুস্তকখানি সকলকে সেই কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

সারকথা

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'—কালেমার এই অংশের অর্থ জানিয়া ইহাকে মানিলে নিম্নলিখিত কাজগুলি অবশ্য কর্তব্য হয় ঃ

১. আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহাকেও সাহায্যকারী, বিপদ হইতে উদ্ধারকারী ও মুক্তিদাতা বলিয়া স্বীকার ও বিশ্বাস করিব না।

২. আল্লাহ্ ছাড়া কেহ ক্ষতি-উপকার করিতে পারে বলিয়া মনে করিতে পারিব না, সকল ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ্র উপর ভরসা করিব।

৩. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও নিকট দো'আ করিতে এবং সাহায্যের প্রার্থনা করিতে পারিব না।

৪. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও ইবাদত বা বন্দেগী করিব না এবং কাহারও নামে মানত করিব না।

৫. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহাকেও প্রভু, আইনদাতা ও বিধানদাতা এবং বাদশাহ বা সার্বভৌম বলিয়া স্বীকার করিব না—অন্য কাহারও আইন মানিব না (এমন আইন মানিব না যাহা মূলত আল্লাহ্র আইনের ভিত্তিতে ও উহার সীমার মধ্যে রচিত হয় নাই)।

৬. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও বান্দাহ্ বা দাস হইয়া থাকিব না এবং নিজের প্রবৃত্তির কামনা ও দেশ-চলতি প্রথাসমূহ অন্ধভাবে অনুসরণ করিব না।

৭. জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে আল্লাহ্র বিধানকে একমাত্র ভিত্তি বলিয়া মানিব ও সেই অনুযায়ী প্রত্যেকটি কাজ আঞ্জাম দিব।

৮. জীবনের প্রত্যেক কাজের জওয়াবদিহি কেবল আল্লাহ্র নিকট করিতে হইবে—এই বিশ্বাস হৃদয়-মনে সদা জাগ্রত রাখিব, এবং যে-কাজে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন সেই কাজ করিতে ও যে-কাজে তিনি অসন্তুষ্ট হন তাহা হইতে বিরত থাকিতে সর্বদা চেষ্টা করিব।

'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'—কালেমার এই শেষ অংশ উচ্চারণ এবং স্বীকার করিলে মানিতে হইবে ঃ

১. হযরত মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশেষ নবী ও রাসূল।

২. তাঁহার মাধ্যমে যে জীবন-বিধান ও হেদায়েত আল্লাহ্র তরফ হইতে আসিয়াছে তাহাই সত্য এবং শাশ্বত।

৩. তাঁহার উপস্থাপিত আদর্শ ও তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষার বিরোধী যাহা তাহা সবই ভুল ও ভ্রষ্টতা এবং অবশ্য পরিত্যাজ্য।

৪. তিনি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিই মানুষের 'স্বাধীন নেতা' হইতে পারে না। তিনিই কালেমা বিশ্বাসীদের একমাত্র চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ নেতা।

৫. অতএব মানব জীবনের প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের হাদীস তথা সুন্নাহ্ অনুসারে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৬. এমন একটি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের জন্য সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা চালাইতে হইবে যাহা এই কালেমা অনুযায়ী আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আইন-বিধান রচনার মৌলিক অধিকার কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্যই স্বীকৃত ও ঘোষিত।

প্রত্যেকটি মুসলমানের ইহাই মূল বিশ্বাস। প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্য ইহাই কর্ম-বিধান

পাঠকের প্রতি

'কালেমা তাইয়্যেবা' আপনি অনবরত পড়িয়া থাকেন। এই বইখানির মাধ্যমে উহার বিস্তারিত অর্থ ও ব্যাখ্যা আপনি জানিতে পারিলেন। ইহাতে আপনার উপর কঠিন দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে।

এক্ষণে আপনাকে প্রথমে বিবেচনা করিতে হইবে, কালেমার এই ব্যাখ্যাসহ ইহার প্রতি আপনি পূর্ণ ও খালেস ঈমান আনিতে পারিতেছেন কিনা। যদি না পারেন তাহা হইলে ইহার প্রতি খালেস ঈমান আনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন। আপনার চিন্তা, বিশ্বাস ও মূল্যমান এই অনুযায়ী ঢালিয়া গঠন করুন।

দ্বিতীয় ঃ এই কালেমার বিস্তারিত ব্যাখ্যার আলোকে আপনি আপনার নিজের কর্মজীবন যাচাই করুন। তাহাতে ইহার বিপরীত কিছু দেখিতে পাইলে তাহা দূর করুন। নিজেকে কালেমা অনুযায়ী পুরাপুরি সংশোধন করিয়া লউন।

তৃতীয় ঃ আপনার গোটা পরিবার ও ঘর-সংসারে এই কালেমার বিপরীত কিছু থাকিলে তাহা সংশোধন করিতে উদ্যোগ গ্রহণ করুন।

চতুর্থ ঃ আপনার পরিবেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, প্রশাসন, শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক লেন-দেন, বিচার-আচার সব কিছুই এই কালেমার মানদণ্ডে যাচাই করুন এবং সব কিছুকে এই কালেমা অনুযায়ী গড়িয়া তোলার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করুন। সে চেষ্টা আপনি একা করিতে পারিবেন না, দলবদ্ধভাবে তাহা করিতে হইবে। অতএব এই চিন্তার লোক জোগাড় করুন এবং ঐক্যবদ্ধ হইয়া কালেমা'কে সমগ্র জীবনের উপর বিজয়ী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা শুরু করিয়া দিন।

আমার সারা জীবনের ইহাই একমাত্র দাওয়াত সমস্ত মানুষের প্রতি।

(মওলানা) মুহাম্মাদ আবদুর রহীম